পঞ্চগ্রামের প্যাঁচাল

একটি রহস্য, হাস্যরস ও সমাজমনস্ক গ্রামজীবনের উপন্যাস

পাঁচ কড়ি

অনাবিল সেনগুপ্ত

পঞ্চগ্রামের প্যাঁচাল

একটি রহস্য, হাস্যরস ও সমাজমনস্ক গ্রামজীবনের উপন্যাস

অনাবিল সেনগুপ্ত

আধিকারিক ওয়েবসাইট
https://anabilsengupta.com/

প্রকাশনা তথ্য

© অনাবিল সেনগুপ্ত

প্রথম বাংলা ডিজিটাল ও মুদ্রণ প্রস্তুত সংস্করণ: ২০২৬

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। লেখকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনো অংশ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পুনর্মুদ্রণ, সংরক্ষণ বা প্রচার করা যাবে না। ব্যক্তিগত পাঠ, সমালোচনা ও আইনসঙ্গত উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধি অনুসরণ করতে হবে।

লেখক: অনাবিল সেনগুপ্ত

সম্পাদনা, পুনর্গঠন ও প্রকাশনা প্রস্তুতি: লেখক নির্দেশিত সম্পাদকীয় প্রক্রিয়া

প্রচ্ছদ, মানচিত্র ও অলংকরণ: মৌলিক ডিজিটাল চিত্রায়ণ

প্রকাশনা পরিচয়: স্বপ্রকাশিত সংস্করণ

আধিকারিক ওয়েবসাইট: https://anabilsengupta.com/

ISBN: বরাদ্দ করা হয়নি

উৎসর্গ

গ্রামবাংলার সেই সব মানুষকে, যাঁরা কথার আড়ালে ইতিহাস,
হাসির আড়ালে ক্ষত এবং প্রতিদিনের ছোট কাজে ভবিষ্যতের বীজ
বয়ে নিয়ে চলেন।

লেখকের কথা

পঞ্চগ্রাম কোনো একটি নির্দিষ্ট গ্রামের প্রতিলিপি নয়। আবার একেবারে কল্পিতও নয়। বাংলার অসংখ্য গ্রামের রাস্তা, হাট, পুকুর, বটতলা, চায়ের দোকান, জমিজমার হিসাব, গুজব, হাসি, ভয় এবং মানুষের সম্পর্ক মিলিয়ে তার জন্ম। এই উপন্যাসের মানুষদের কেউ একা ভালো নয়, কেউ একা খারাপও নয়। তারা ভুল করে, মুখ বাঁচায়, কৌতুক করে, অন্যায় সহ্য করে, কখনো অন্যায়ও করে। আবার প্রয়োজনের মুহূর্তে তারাই কাঁধে কোদাল তুলে অন্ধকারে বেরিয়ে পড়ে।

এই কাহিনির কেন্দ্রে একটি চিঠি আছে। সেই চিঠি একটি সম্ভাব্য দুর্ঘটনার সতর্কবার্তা দেয়, কিন্তু তার চেয়েও বড় করে সামনে আনে বহুদিনের গোপন হিসাব। জমির হিসাব, জলের হিসাব, সম্পর্কের হিসাব, সামাজিক স্বীকৃতির হিসাব এবং ইতিহাসে কার নাম লেখা হলো আর কার নাম মুছে গেল, সেই হিসাব। রহস্যের সমাধান এখানে শুধু অপরাধী ধরা নয়। সত্য জানার পরে মানুষ কী করে, সেটিই বড় প্রশ্ন।

কুসংস্কার ও যুক্তির দ্বন্দ্বও এই গল্পে আছে। তবে যুক্তি কোনো এক ব্যক্তির একচেটিয়া সম্পত্তি নয়। বই পড়া মানুষ ভুল করতে পারে, আবার তথাকথিত অশিক্ষিত মানুষের দেখা একটি ক্ষুদ্র চিহ্ন সত্যের দরজা খুলে দিতে পারে। ব্যক্তিগত বিশ্বাস নয়, ভয়কে ব্যবসায় পরিণত করা এবং ক্ষমতার সুবিধায় মানুষের দুর্বলতাকে ব্যবহার করাই এই উপন্যাসের ব্যঙ্গের লক্ষ্য।

পঞ্চগ্রামের প্যাঁচাল লিখতে গিয়ে আমার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ছিল মানুষের কথাবার্তা। একটি খবর পাঁচ পাড়া ঘুরে কীভাবে পাঁচ রূপ নেয়, একটি সাধারণ ঘটনা কীভাবে হাটতলার সংসদে রাষ্ট্রীয় সংকট হয়ে ওঠে, এবং হাসির মাঝখানে হঠাৎ কীভাবে কোনো মানুষের দীর্ঘদিনের অপমান দেখা দেয়, সেই পরিবর্তনই এই বইয়ের প্রাণ।

পাঠক পঞ্চগ্রামকে সত্যি বলে বিশ্বাস করবেন কি না, তা আমি জানি না। তবে বই শেষ করার পরে হাটতলার কারও মুখ যদি পরিচিত মনে হয়, কোনো কথার মধ্যে নিজের সমাজকে দেখতে পান, আর গোলাপী হাঁসটির জন্য সামান্য দুশ্চিন্তা হয়, তাহলে এই উপন্যাসের যাত্রা সার্থক হবে।

অনাবিল সেনগুপ্ত

২০২৬

প্রধান চরিত্র

কুসুম সামন্ত কলাবাগানের তরুণী। অসমাপ্ত পড়াশোনা, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ এবং নিজের জীবনের পথ খুঁজে পাওয়ার লড়াই তার সঙ্গী।

জগন্নাথ মাস্টার পঞ্চগ্রাম স্কুলের শিক্ষক। যুক্তির পক্ষে দৃঢ়, কিন্তু মানুষের অনুভূতি বুঝতে গিয়ে মাঝে মাঝে হোঁচট খান।

হরিহর রায় পঞ্চগ্রামের মোড়ল। ক্ষমতা, বংশগৌরব, গোপন দায় এবং একাকিত্ব তাঁর ভিতরে পাশাপাশি থাকে।

হরেন রায় হরিহরের ভাইপো। মোবাইল মেরামত শিখে নিজের পরিচয় গড়তে চায়। কৌতূহল তাকে সূত্রও দেয়, বিপদেও ফেলে।

ভোলানাথ ঘোষাল গ্রামের গল্পবাজ প্রবীণ। তাঁর কথায় সত্য ও কল্পনা এমনভাবে মেশে যে কখন বিশ্বাস করতে হবে, কেউ জানে না।

পঞ্চানন পণ্ডিত পঞ্জিকা, প্রবাদ ও পুরনো লোককথার ধারক। তিনি কুসংস্কারমুক্ত নন, কিন্তু প্রতারণার সঙ্গীও নন।

মাখন ঠাকুর ভয় কাটানোর নামে ভয়কেই পুঁজি করে চলা ব্যবসায়ী।

শিবু পাল গ্রামে শিবুডাক্তার নামে পরিচিত। সীমিত জ্ঞানকে দীর্ঘদিন নিশ্চিত চিকিৎসা বলে চালালেও একসময় নিজের সীমা চিনতে শেখেন।

নন্দলাল সেন গ্রামীণ নথি ও লোককথার গবেষক। পঞ্চগ্রামের সঙ্গে তাঁর নিজের পরিবারেরও একটি হারানো যোগ আছে।

চন্দনা সামন্ত কুসুমের মাসি। নিজের কাজ, সম্মান ও সম্পর্কের শর্ত নিজেই স্থির করেন।

ফুলমতি দে বহু বছরের অস্বীকৃত সম্পর্ক এবং একটি হারানো দলিলের পৃষ্ঠা নিয়ে পঞ্চগ্রামে ফিরে আসা নারী।

গোলাপী হরিহরের আদরের হাঁস। ডান পায়ে নীল ফিতা। গ্রামের বহু মানুষের চেয়ে কম কথা বলেও সে বেশি সূত্র রেখে যায়।

সূচিপত্র

পর্ব এক: পঞ্চগ্রাম

১. চিঠি

২. কাগজের গন্ধ

৩. হাটতলার বিচার

৪. পূর্ণিমার আগে

পর্ব দুই: গুজবের গ্রাম

৫. গোলাপীর অন্তর্ধান

৬. শিবুর ওষুধ

৭. রাতের আওয়াজ

৮. রামলোচনের সিদ্ধান্ত

পর্ব তিন: বটতলার নিচে

৯. নন্দলাল

১০. ভুল মানচিত্র

১১. বটতলার রাত

১২. লোহার বাক্স

পর্ব চার: পুরনো হিসাব

১৩. পাঁচ কড়ির চিহ্ন

১৪. হারানো পৃষ্ঠা

১৫. চন্দনার কথা

১৬. পানির পথ

পর্ব পাঁচ: মুখোশ

১৭. সোনালি বালিশ

১৮. মাখনের আসর

১৯. শিবুর ভুল

২০. ফুলমতি

পর্ব ছয়: পূর্ণিমার রাত

২১. স্বীকৃতির ছবি

২২. ভাঙা বাঁধ

২৩. পাঁচ পাড়ার সভা

২৪. রাতের মিছিল

২৫. বটতলার হিসাব

পর্ব সাত: পঞ্চগ্রামের সকাল

২৬. দলিলের পাঠ

২৭. হাটতলার রায়

২৮. নতুন চিঠি

লেখক পরিচিতি

পঞ্চগ্রামের মানচিত্র

গল্পে ব্যবহৃত স্থানগুলোর পারস্পরিক অবস্থান অনুসারে প্রস্তুত কল্পিত মানচিত্র।

একটি গ্রামের সবচেয়ে দ্রুতগামী বস্তু তার খবর।

জল তার পুরনো পথ চাইবে

১. চিঠি

মোড়লবাড়ির সদর দরজায় চিঠিটা আটকে ছিল কাঁঠাল গাছের কাঁটা দিয়ে। রাতের বৃষ্টিতে উঠোন কাদা হয়ে গেছে, দরজার নিচ দিয়ে জল ঢুকে বারান্দা পর্যন্ত ভিজিয়েছে, অথচ কাগজের কালো অক্ষর একটুও ছড়ায়নি।

হরেন প্রথমে কাগজটার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ভোরের আলো তখনও পুরো হয়নি। পুকুরের দিক থেকে হাঁসের চাপা ডাক আসছিল, বাঁশবনের মাথায় জমা জল একসঙ্গে ঝরে পড়ছিল, আর দোতলার খড়খড়ি বন্ধ থাকায় বাড়িটাকে দূর থেকে ঘুমন্ত নয়, অভিমানী মনে হচ্ছিল।

সে কাঁটাটা খুলল না। দরজার পাশ থেকে মুখ বাড়িয়ে ডাকল, “কাকা, একবার নেমে আসবে?”

উপর থেকে হরিহর মোড়লের বিরক্ত গলা এল, “ভোরবেলা কী ভাঙল?”

“কিছু ভাঙেনি। তবে কে যেন ভাঙবে বলে লিখে গেছে।”

এই উত্তর শুনে খড়খড়ি খুলল। হরিহর প্রথমে শুধু চোখ দেখালেন, তারপর মুখ, তারপর গোঁফ। তাঁর গোঁফের দুই প্রান্ত সাধারণত ঘুম থেকে উঠেও যথাস্থানে থাকে। আজ বাঁদিকটা একটু নুয়ে ছিল।

“কী লিখেছে?”

হরেন দরজার কাছে না গিয়ে কাগজের দিকে আঙুল দেখাল। “নিজে পড়ো।”

“তুই পড়তে পারিস না?”

“পারি। সেই জন্যই তোমাকে ডাকছি।”

হরিহর নিচে নেমে এলেন। বারান্দার শেষ ধাপে পা রাখার আগে থামলেন। কাগজে বড় বড় অক্ষরে লেখা ছিল:

“বর্ষার শেষ পূর্ণিমার রাতে মহা দুর্ঘটনা ঘটবে। জল তার পুরনো পথ চাইবে। বটতলায় হিসাব মেলাও। সতর্ক হও।”

শেষ লাইনের নিচে পাঁচটি ছোট কালো বিন্দু। চারটি পাশাপাশি, পঞ্চমটি একটু দূরে।

হরিহর দুবার পড়লেন। প্রথমবার ঠোঁট নড়ল। দ্বিতীয়বার গোঁফের নুয়ে থাকা প্রান্তটাও যেন আরও নিচে নামল।

“কে দিয়েছে?”

“আমি জানলে তোমাকে ডাকতাম না।”

“রাতে কিছু শুনিসনি?”

হরেন মাথা নাড়ল। তারপর একটু ভেবে বলল, “গোলাপী ডেকেছিল। কিন্তু ও তো মাঝরাতেও ডাকে। নিজের ছায়া দেখলেও ডাকে।”

এই সময় পুকুরের দিক থেকে গোলাপী নিজেই দেখা দিল। সাদা হাঁসটির গলায় হালকা বাদামি ছোপ, ডান পায়ে নীল কাপড়ের ফিতা। নাম গোলাপী কেন, সে বিষয়ে পঞ্চগ্রামে অন্তত সাতটি মত আছে। হরিহর বলেন ছোটবেলায় ঠোঁট গোলাপি ছিল। ভোলানাথ বলেন পূর্ণিমার আলোয় পালক গোলাপি দেখেছিলেন। সুধীরের দাবি, নাম রাখার দিন রঙ নিয়ে কেউ ভাবেনি, চায়ের দোকানে গোলাপজামুন ছিল।

গোলাপীর পা দুটো আজ নীলচে কাদায় মাখা। মোড়লবাড়ির পুকুরে এমন কাদা নেই।

হরেন সেটা দেখেছিল, কিন্তু বলার আগেই হরিহর চিৎকার করে দাসুকে ডাকলেন। দাসু এল না। বদলে রান্নাঘর থেকে বিনাপিসি বললেন, “দাসু কাল বাজারপাড়ায় গেছে। চেঁচিয়ে কাগজের লেখক বের হবে না।”

বিনাপিসি হরিহরের বাবার ছোট বোন। বয়স সত্তরের কাছাকাছি। বাড়ির অন্যরা তাঁকে বৃদ্ধা ভাবলেও তিনি নিজে মনে করেন, হাঁটতে পারা পর্যন্ত কেউ বৃদ্ধ নয়।

“লেখক পরে বের হবে। আগে দরজা খুলব কী করে?” হরিহর বললেন।

পিসি বারান্দায় এসে কাগজ দেখলেন। “কাঁটা খুলে।”

“হাত দেব?”

“তোমার জমির কাগজ হলে হাত দিতে ভয় পাও না।”

হরেন মুখ নিচু করে হাসল। হরিহর তার দিকে তাকাতেই হাসিটা কাশিতে বদলে গেল।

সদর দরজার সামনে লোক জমতে বেশি সময় লাগল না। পঞ্চগ্রামে খবর ছড়ানোর জন্য ঢাক লাগে না। একজন জল আনতে গিয়ে দেখে, আরেকজন গরু খুলতে গিয়ে শোনে, তৃতীয়জন নিশ্চিতভাবে বলে সে রাতেই সন্দেহ করেছিল। সূর্য ওঠার আগেই মোড়লপাড়া থেকে খবর হাটতলায় পৌঁছল। হাটতলা থেকে খবর যখন মোল্লাপাড়ায় গেল, তখন চিঠির কাগজে আগুনের দাগ যোগ হয়েছে। পটলপাড়ায় পৌঁছতে পৌঁছতে পাঁচটি বিন্দু পাঁচটি কাটা মাথা। কলাবাগানে বলা হলো, পূর্ণিমায় বটগাছ উঠে হাঁটবে।

সবার আগে এলেন ভোলানাথ ঘোষাল। বয়স চৌষট্টি হলেও খবরের গন্ধ পেলে তিনি এমন হাঁটেন, যেন পথের শেষ মানুষটি তাঁর গল্প শোনার আগেই মারা যাবে। কাঁধের গামছা সামলে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, “কাগজে হাত দিও না। এ ধরনের চিঠি আমি আগে দেখেছি।”

হরিহর জিজ্ঞেস করলেন, “কোথায়?”

ভোলা দা চোখ ছোট করলেন। “ঠিক জায়গাটা এখন বলা যাবে না।”

“মনে নেই?”

“মনে আছে বলেই বলা যাবে না।”

তারপর এলেন পঞ্চানন পণ্ডিত। তিনি চিঠির তারিখ জানতে চাইলেন। চিঠিতে তারিখ নেই শুনে পঞ্জিকা খুললেন। পঞ্জিকার পাতায় বৃষ্টির ফোঁটা পড়তেই হরেন ছাতা

ধরল। পঞ্চানন বললেন, "পূর্ণিমার রাতকে হালকা করে দেখার কারণ নেই। তবে ভয় পাওয়ারও কারণ নেই। আগে বোঝা দরকার, বর্ষার শেষ বলতে ভাদ্র, না আশ্বিন।"

ভোলা দা বললেন, "যে লিখেছে সে নিশ্চয় পঞ্জিকার ছাত্র ছিল না। কাছের পূর্ণিমাই বোঝাতে চেয়েছে।"

"অশরীরীর সময়জ্ঞান তোমার চেয়ে ভালো হতে পারে," পঞ্চানন শান্তভাবে বললেন।

ভিড়ের পেছন থেকে মৃদু হাসি উঠল। ভোলা দা শুনেও না শোনার ভান করলেন।

শিবু পাল এলেন গলায় পুরনো স্টেথোস্কোপ ঝুলিয়ে। গ্রামের কেউ অসুস্থ না হলেও তিনি সেটি সঙ্গে রাখেন। এতে কথার ওজন বাড়ে। কাগজের দিকে তাকিয়ে বললেন, "এতে কোনো রাসায়নিক মাখানো থাকতে পারে। চামড়ায় লাগলে জ্বর, মাথা ঘোরা, স্মৃতি লোপ, অনেক কিছু হয়।"

জগন্নাথ মাস্টার ঠিক তখনই পৌঁছেছিলেন। ছাতার জল ঝেড়ে বললেন, "কোন রাসায়নিক?"

শিবু এক মুহূর্ত থামলেন। "সব নাম সাধারণ মানুষকে বলা যায় না।"

"আপনিও সাধারণ মানুষের মধ্যেই পড়েন।"

"আমি চিকিৎসার মানুষ।"

"সেটা নিয়েই তো আলোচনা।"

হরিহর হাত তুলে দুজনকে থামালেন। "আমার দরজায় বিপদের চিঠি। তোমরা নিজেদের হিসাব পরে মেলাবে।"

মাখন ঠাকুর ভিড়ের শেষ দিকে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কখন এসেছেন কেউ খেয়াল করেনি। তাঁর কাঁধে উজ্জ্বল লাল উত্তরীয়, আঙুলে তিনটি পাথরের আংটি। তিনি কাগজের দিকে না তাকিয়ে মানুষের মুখ দেখছিলেন। কার চোখে কতটা ভয়, সেটাই তাঁর প্রয়োজনীয় লেখা।

তিনি নরম গলায় বললেন, “ভয়কে অবহেলা করাও ঠিক নয়। এমন সময়ে বাড়ির পাঁচ কোণে সুরক্ষার বাঁধন দিতে হয়। ব্যবস্থা আমার কাছে আছে।”

সুধীরের চায়ের দোকান তখনও খোলেনি, কিন্তু মাখনের ব্যবসা খুলে গেল।

কুসুম এল সবার পরে। কারণ খবর সে দেরিতে পায়নি, বরং আগে মাকে ওষুধ খাইয়ে, চুল বেঁধে, ভেজা উঠোনে পা না পিছলে আসতে সময় নিয়েছে। ভিড় সরল না। সে গোপালের কাঁধ আর ভোলার গামছার মাঝখান দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলল, “চিঠিটা কে প্রথম দেখেছে?”

হরেন হাত তুলল।

“ছুঁয়েছ?”

“না।”

“আর কে ছুঁয়েছে?”

হরিহর বললেন, “কেউ না। সবাই শুধু কথা ছুঁয়েছে।”

কুসুম হাঁটু মুড়ে বসে কাগজটা দেখল। কাঁঠালের কাঁটা দরজার পুরনো ফাঁকে ঢোকানো। কাগজ ভিজেছে, কিন্তু অক্ষর ছড়ায়নি। পাঁচটি বিন্দুর মধ্যে চারটি ঘন, একটি ফ্যাকাসে। সে চোখের কাছে নিয়ে দেখল না। দূর থেকেই বলল, “এটা এক পিঠে নতুন লেখা। অন্য পিঠে কিছু আছে।”

“তুমি উল্টো পিঠ দেখলে কী করে?” জগন্নাথ জিজ্ঞেস করলেন।

“কাগজ ভিজলে পাতলা হয়।”

হরেন এবার কাঁটাটা সাবধানে খুলল। কুসুম কাগজের দুই কোণ ধরে আলোয় তুলল। উল্টো পিঠে বাদামি রঙের কয়েকটি দাগ, একটি বাঁকা রেখা এবং কাটা অক্ষরের মতো কিছু দেখা গেল।

ভোলা দা সামনের দিকে ঝুঁকে এলেন। তাঁর মুখের গল্পবাজ ভাব এক মুহূর্তে বদলে গেল।

“ওই রেখাটা কোথায় দেখেছি,” তিনি বললেন।

হরিহর তাকালেন। “এবারও জায়গা বলা যাবে না?”

ভোলা দা উত্তর দিলেন না।

কুসুম কাগজটি আরও ওপরে ধরল। ফ্যাকাসে আলোয় পাঁচটি বিন্দু স্পষ্ট হলো। সেগুলো কালি দিয়ে আঁকা নয়। কাগজের ভিতরেই বসানো পুরনো ছাপ।

পঞ্চানন খুব আস্তে বললেন, “পাঁচ কড়ির চিহ্ন।”

জগন্নাথ তাঁর দিকে ফিরলেন। “নামটা জানলেন কী করে?”

পঞ্চানন পঞ্জিকা বন্ধ করলেন। “নামটা আমি দিইনি।”

ঠিক তখন গোলাপী ভিড়ের মধ্যে ঢুকে কাগজের নিচে ঠোঁট বাড়াল। তার নীল কাদা মাখা পা থেকে এক ফোঁটা জল পড়ে দরজার ধুলোয় ছোট গোল দাগ করল। তারপর আরেকটি। তারপর সে এমন নিশ্চিন্তে হেঁটে গেল, যেন পূর্ণিমার আগেই তার নিজের হিসাব মেলানো আছে।

কুসুম দাগগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল। মোড়লবাড়ির পুকুরের কাদা কালচে। এই কাদা নীল। এমন কাদা সে এক জায়গাতেই দেখেছে। কলাবাগানের পেছনে বহুদিন বন্ধ পড়ে থাকা পুরনো খালের মুখে।

কিন্তু সেখানে গোলাপী গেল কী করে, আর চিঠির লেখক জলকে কোন পুরনো পথের কথা মনে করিয়ে দিতে চাইছে, সে প্রশ্ন তখনও কেউ করেনি।

হাটতলায় সকালবেলার প্রথম কেটলিটা চড়ার আগেই পঞ্চগ্রামের পাঁচ পাড়া পাঁচ রকম উত্তর বানিয়ে ফেলেছিল।

* * *

২. কাগজের গন্ধ

সুধীর সাহার চায়ের দোকানকে দোকান বলা চলে, আবার চলে না। বাঁশের খুঁটির ওপর টিনের চাল, সামনে তিনটি বেঞ্চ, এক পাশে চায়ের কেটলি, অন্য পাশে খাতা, খাম, পেন্সিল, সাবান, দেশলাই, নুন, তেল এবং এমন কয়েকটি জিনিস যেগুলো কেউ কিনতে আসে না, তবু বছরের পর বছর তাকেই থাকে। গ্রামের যে মানুষটি চা খেতে আসে, সে কোনো না কোনো খবর রেখে যায়। যে ধার নেয়, সে নিজের নামও রেখে যায়। সেই কারণে সুধীরের ধারখাতাকে জগন্নাথ মাস্টার বলেন পঞ্চগ্রামের অনানুষ্ঠানিক নথিশালা।

চিঠি পাওয়ার ঘণ্টাখানেকের মধ্যে হরিহর সেখানে একটি জরুরি বৈঠক ডাকলেন। জরুরি বৈঠকের খবর শুনে সুধীর প্রথমে বড় কেটলিতে জল বসাল। কারণ পঞ্চগ্রামে জরুরি অবস্থার সঙ্গে চায়ের সম্পর্ক সরাসরি।

কুসুম কাগজটা শুকনো খবরের কাগজের ওপর রেখেছিল। পাশে জগন্নাথ, হরেন এবং পঞ্চানন। ভোলা দা বেঞ্চের এক প্রান্তে বসে নিজের স্মৃতি খুঁজছিলেন। তাঁর স্মৃতি সাধারণত মানুষ ডাকলেই আসে না। চায়ের প্রথম চুমুকের পরে কিছুটা, দ্বিতীয় চুমুকের পরে আরও কিছুটা আসে।

“কাগজটা নতুন নয়,” কুসুম বলল। “কিন্তু লেখা নতুন।”

জগন্নাথ আঙুল না ছুঁইয়ে চোখ নামিয়ে বললেন, “কালি জল সহ্য করেছে। হয়তো বলপেন।”

হরেন বলল, “আমার মোবাইলের আলো ফেললে ভালো দেখা যাবে।”

“দিনের আলোয় মোবাইলের আলো দিয়ে কী বাড়বে?” কুসুম জিজ্ঞেস করল।

হরেন ফোনটা পকেটে রাখল। “প্রযুক্তির প্রতি তোমার শ্রদ্ধা কম।”

“সিগনাল ছাড়া প্রযুক্তিকে তুমি যতটা শ্রদ্ধা করো, ততটা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।”

সুধীর চা ঢালতে ঢালতে বলল, “কাল রাতে কে কে কাগজ কিনেছে, সেটা জানতে চাইছ তো?”

সবাই তার দিকে তাকাল।

“আমি মুখ মনে রাখি না,” সুধীর বলল। “খাতা মনে রাখে।”

সে তাকের পেছন থেকে মোটা একটি ধারখাতা বার করল। পাতাগুলো তেল আর চায়ের দাগে ভারী। আগের দিনের হিসাবের নিচে লেখা ছিল: ভোলানাথ ঘোষাল, এক দিস্তা সাদা কাগজ, এক কালো কলম, দুই কাপ চা, আগের ধারসহ তিন টাকা পঁচাত্তর পয়সা।

হাটতলার বাতাস এক মুহূর্তে থেমে গেল বলে মনে হলো। ভোলা দা কাপ নামিয়ে বললেন, “কাগজ কিনলেই মানুষ অপরাধী হয় না। তা হলে ছাত্রদের সবাইকে জেলে দিতে হবে।”

হরিহর টেবিলে হাত চাপড়ালেন। “তুমি কী লিখেছ?”

“কবিতা।”

“শুনব।”

ভোলা দা একটু কাশলেন। “এখনও সম্পূর্ণ হয়নি।”

“যেটুকু হয়েছে।”

“কবিতা অসম্পূর্ণ শুনলে কবির ক্ষতি হয়।”

“গ্রামের ক্ষতি হবে কি না, সেটা আগে বুঝব।”

ভোলা দা চারদিকে তাকালেন। সবার চোখে এমন কৌতূহল, যেন কবিতার থেকেও স্বীকারোক্তি বেশি সুরেলা হবে। তিনি গামছার কোণ মুচড়ে বললেন, “আচ্ছা, একটা কাগজ লিখেছিলাম। কিন্তু ওটা এই কাগজ নয়।”

হরেন বলল, “কোথায় রেখেছ?”

ভোলা দা সুধীরের দোকানের পেছনের খালি চায়ের বাক্সের দিকে আঙুল দেখালেন। সুধীর বাক্সটি টেনে বের করতেই একটি ভাঁজ করা সাদা কাগজ পাওয়া গেল। তাতে লেখা:

"পূর্ণিমায় বটগাছ নড়বে। যার গোঁফ আছে, সে আগে পালাও।"

ভিড়ের চোখ প্রথমে কাগজে, তারপর হরিহরের গোঁফে গেল। হরিহর ধীরে ধীরে ভোলার দিকে ফিরলেন।

ভোলা দা বললেন, "আমি গ্রামের ভয় একটু হালকা করতে চেয়েছিলাম।"

জগন্নাথ বললেন, "ভয় হালকা করতে নতুন ভয় লিখলেন?"

"হাসির ভয় আলাদা।"

কুসুম দুই কাগজ পাশাপাশি রাখল। ভোলার কাগজ উজ্জ্বল সাদা। মোড়লবাড়ির কাগজ হলদেটে এবং তন্তুযুক্ত। হাতের লেখাও আলাদা। প্রথম কাগজের অক্ষর সোজা, ভোলার অক্ষর ডান দিকে হেলে।

"ভোলা দা প্রথম চিঠি লেখেননি," কুসুম বলল।

হরিহর অসন্তুষ্ট হলেন। "কাগজ কিনেছে, আর হুবহু পূর্ণিমা, বটগাছ লিখেছে। তা হলে জানল কী করে?"

ভোলা দা এবার চুপ।

পঞ্চানন তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, "যেটা মনে পড়ছিল, এবার বলো।"

ভোলা দা চায়ের কাপের তলায় জমা পাতলা চা দেখলেন। তারপর বললেন, "ছোটবেলায় বাবার কাপড়ের দোকানে একটা পুরনো খাতা ছিল। খাতার প্রথম পাতায় পাঁচটা গোল দাগ। এক বুড়ো লোক একদিন বলেছিল, পাঁচ কড়ির হিসাব না মেলালে জল কাউকে মানবে না। গত মাসে সুধীরের পুরনো কাগজের বোঝায় ওই খাতার ছেঁড়া পাতা দেখেছি। মনে হয়েছিল গল্প বানানো যায়।"

সুধীর থেমে গেল। "আমার বোঝায়?"

“পিছনের ঘরে যে পুরনো কাগজ রেখেছ।”

সুধীর দোকানের আড়াল থেকে আরেকটি গাদা টেনে আনল। পুরনো খাতা, স্কুলের প্রশ্নপত্র, ফাটা ক্যালেন্ডার, চালানের নকল। কুসুম এক এক করে দেখল। কোনো পাতায় পাঁচ বিন্দু নেই।

“কেউ নিয়ে গেছে?” হরেন বলল।

সুধীর মাথা নেড়ে বলল, “পুরনো কাগজ কে নেয়, আমি হিসাব রাখি না। ওজন করে বিক্রি করি।”

জগন্নাথ বললেন, “প্রথম চিঠির লেখক হয়তো ওই পুরনো পাতা পেয়েছে।”

“অথবা বাড়ির ভেতরের কোনো খাতা থেকে নিয়েছে,” কুসুম বলল। “কাগজের গায়ে একটা গন্ধ আছে।”

সবাই ঝুঁকে গেল।

“কী গন্ধ?” হরেন জিজ্ঞেস করল।

“কর্পূর আর পুরনো কাপড়ের।”

পঞ্চানন বললেন, “পুরনো দলিলের বাক্সে এমন গন্ধ হয়।”

হরিহর সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে বসলেন। “আমাদের বাড়ির সঙ্গে এর যোগ কেন হবে?”

কুসুম উত্তর দিল না। সে শুধু দেখল, হরিহরের ডান হাতের আঙুল টেবিলের ওপর একবার, দুবার, তিনবার ঠুকছে। লোকটি রাগলে গোঁফে হাত দেন। ভয় পেলে আঙুল ঠোকেন।

মাখন ঠাকুর এতক্ষণ দোকানের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল। এবার ভেতরে এসে ভোলার নকল চিঠি হাতে নিয়ে হেসে বলল, “দেখলেন তো, মানুষের লেখা চিঠিও কখনো কখনো অদৃশ্য শক্তির পথ খুলে দেয়। পাঁচ কোণের বাঁধন আজ থেকেই শুরু করা ভালো।”

সুধীর বলল, “তোমার বাঁধনের দাম কত?”

“ভয় যত বড়, ব্যবস্থা তত শক্ত।”

“দাম?”

“পরিবারভেদে।”

সুধীর কেটলির ঢাকনা বসিয়ে দিল। “চা সবার এক দামে। ভয়ও এক দামে রাখলে হিসাব সহজ হতো।”

দোকানের ভেতর চাপা হাসি উঠল। মাখন হাসল না। সে ভিড়ের মধ্যে সেই সব মুখ খুঁজল, যাদের কাছে হিসাবের চেয়ে ভয় বড়।

বৈঠকের শেষে হরিহর ঘোষণা করলেন, ভোলানাথকে এক সপ্তাহ হাটতলায় দাঁড়িয়ে নিজের নকল চিঠির কথা বলতে হবে, যাতে গুজব থামে। ভোলা দা প্রতিবাদ করলেন না। তাঁর ভিতরে সামান্য লজ্জা ছিল, তার চেয়ে বেশি ছিল এই সুযোগে সাত দিন ধরে নিজের সংস্করণ বলার আনন্দ।

সবাই যখন চলে যাচ্ছে, সুধীর কুসুমকে ডাকল। ধারখাতার নিচে আটকে থাকা একটি ছোট পিতলের পিন দেখাল। পিনটির মাথায় পাঁচটি খুদে গর্ত।

“কাল রাতের আগে এটা এখানে ছিল না,” সে বলল। “কাগজের বোঝা নড়ানোর সময় পড়েছে হয়তো।”

কুসুম পিনটি হাতে নিল না। খবরের কাগজের ওপর রেখে আলোয় দেখল। পাঁচটি গর্তের বিন্যাস প্রথম চিঠির বিন্দুর মতো। চারটি পাশাপাশি, পঞ্চমটি সামান্য দূরে।

দোকানের বাইরে বৃষ্টি আবার শুরু হয়েছিল। টিনের চালের শব্দে কেউ খেয়াল করল না, হরিহর মোড়ল ফিরে এসে দরজার ফাঁক থেকে পিনটির দিকে একবার তাকালেন, তারপর কোনো কথা না বলে চলে গেলেন।

* * *

৩. হাটতলার বিচার

হরিহর মোড়ল বিচার করতে ভালোবাসতেন। বিচার মানে তাঁর কাছে এমন একটি সভা যেখানে সবাই অনেকক্ষণ কথা বলবে, শেষে তিনি আগেই ঠিক করে রাখা সিদ্ধান্ত জানাবেন। কিন্তু চিঠির ঘটনায় অসুবিধা হলো, সিদ্ধান্ত আগেই ঠিক করা যাচ্ছিল না। ভোলানাথ নকল চিঠি লিখেছেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। প্রথম চিঠি কে লিখেছে, কেন পুরনো কাগজ ব্যবহার করেছে, পাঁচ বিন্দুর অর্থ কী, এসব প্রশ্ন আবার আগের মতোই দাঁড়িয়ে আছে।

তবু তিনি হাটতলায় সভা ডাকলেন। বটগাছের নিচে বাঁশের মোড়া বসানো হলো। সুধীর দোকানের সামনে আলাদা করে চা বানাল। পটলপাড়ার লোকেরা কাদা মাড়িয়ে এল, মোল্লাপাড়া থেকে মদন তার পুরনো হারমোনিয়াম নিয়ে হাজির হলো, কারণ সে শুনেছিল সভার পরে গান হতে পারে। কেউ তাকে গান গাইতে বলেনি, তবু সম্ভাবনাকে অবহেলা করা তার স্বভাবে নেই।

হরিহর মাঝখানে বসে বললেন, “আজ তিনটি বিষয়। প্রথমত, ভোলানাথের অপরাধ। দ্বিতীয়ত, রহস্যময় চিঠি। তৃতীয়ত, গ্রামের শান্তি।”

গোপাল কর্মকার পেছন থেকে বলল, “চা আগে হবে, না শান্তি?”

সুধীর বলল, “চা হয়েছে। শান্তি নিজেরা দেখো।”

ভোলা দা উঠে দাঁড়ালেন। “আমি স্বীকার করছি, দ্বিতীয় কাগজটি আমি লিখেছি। উদ্দেশ্য ছিল সাহিত্যচর্চা।”

“সাহিত্য কোথায়?” জগন্নাথ জিজ্ঞেস করলেন।

“গোঁফওয়ালা আগে পালাবে, এই বাক্যে সামাজিক ইঙ্গিত আছে।”

হরিহর গম্ভীর হলেন। “আমার গোঁফকে সামাজিক বিষয় কোরো না।”

ভিড় থেকে কয়েকজন মুখ চাপল।

কুসুম বলল, “ভোলা দার কাজ ভুল। কিন্তু তাঁর ভুল দিয়ে প্রথম চিঠির বিচার শেষ করা যাবে না।”

হরিহর চোখ সরু করলেন। “তোমার প্রমাণ?”

“দুই কাগজ আলাদা। দুই হাতের লেখা আলাদা। প্রথম কাগজের পুরনো ছাপ ভোলা দার কেনা কাগজে নেই। আর পিতলের পিনটি কোথা থেকে এল, সেটাও জানা যায়নি।”

জগন্নাথ সায় দিলেন। “সন্দেহকে প্রমাণ বলা যাবে না।”

পঞ্চানন বললেন, “আবার প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত পুরনো স্মৃতিকে মিথ্যেও বলা যাবে না। পাঁচ কড়ির গান আমি ছোটবেলায় শুনেছি।”

হরিহর বললেন, “গান দিয়ে জমির হিসাব হয়?”

“গান মানুষকে মনে রাখায়। কাগজ পচে, মুখের কথা ঘুরে বাঁচে।”

জগন্নাথ একটু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন, “মুখের কথা ঘুরতে ঘুরতে সত্য বদলায়।”

পঞ্চানন তাঁর দিকে তাকালেন। “কাগজও বদলায়, মাস্টারমশাই। শুধু কালি শুকিয়ে গেলে বদলটা ধরা কঠিন হয়।”

বাক্যটি শুনে হরিহরের মুখে মুহূর্তের জন্য ছায়া এল। কুসুম দেখল। জগন্নাথ দেখলেন না, কারণ তখন তিনি মৌখিক ইতিহাসের সীমাবদ্ধতা ব্যাখ্যা করতে ব্যস্ত।

মাখন ঠাকুর সুযোগ বুঝে উঠে দাঁড়াল। তার দুই সহকারী একটি ঝুড়ি থেকে লাল সুতো, ছোট পুঁটলি আর পিতলের পাত বার করছিল।

“আপনারা তর্ক করুন,” মাখন বলল। “কিন্তু বিপদ অপেক্ষা করে না। পাঁচ বিন্দু মানে পাঁচ দরজা। প্রতিটি দরজা রক্ষা করতে আলাদা বাঁধন লাগে।”

কেউ জিজ্ঞেস করল, “পাঁচটি বাঁধনের দাম?”

“যার যত সামর্থ্য।”

সুধীর দোকান থেকে বলল, “সামর্থ্য তোমার চোখেই বোঝা যায়?”

“অভিজ্ঞতা আছে।”

মাখনের প্রথম ক্রেতা হলেন মোড়লপাড়ার ধনী ধান ব্যবসায়ী মহিম সর্দার। তিনি পাঁচটি পুঁটলি কিনে বললেন, “সতর্কতা ভালো। আমি কুসংস্কার মানি না, তবে ব্যবস্থা রাখতে দোষ কী?”

এই বাক্য শুনে যারা কুসংস্কার মানে না বলে পরিচিত হতে চায়, তাদের কয়েকজনও পুঁটলি কিনল। অল্প সময়ের মধ্যে মাখনের ঝুড়ি প্রায় খালি।

কুসুম মহিমকে লক্ষ্য করছিল। লোকটি সাধারণত সভায় মাঝখানে বসে, আজ মাখনের পাশে। গত মাসে সে পুরনো খালের ধারের জমিতে গুদাম করার কথা বলেছিল। গ্রামের কেউ গুরুত্ব দেয়নি, কারণ জায়গাটি বর্ষায় জল দাঁড়ায়। এখন যদি মানুষ জায়গাটিকে ভয় পেতে শুরু করে, দাম কমে যাবে। ভাবনাটি কুসুমের মাথায় এল, কিন্তু সে বলল না। কারণ প্রমাণের আগে সন্দেহকে কথা বানানো ভোলার কাজ, তার নয়।

হরেন পিতলের পিনটি একটি কাচের শিশিতে রেখে এনেছিল। সে সবার সামনে তুলতেই বিনাপিসি মোড়লবাড়ির বারান্দা থেকে পাঠানো লোকের হাতে খবর দিলেন, এমন পিন আগে বাড়ির পুরনো নথিতে ব্যবহার হতো।

হরিহর বিরক্ত হয়ে বললেন, “পিসি সব পুরনো জিনিসকে আমাদের বাড়ির বলে ভাবেন।”

“তিনি কি পিনটি দেখেছেন?” কুসুম জিজ্ঞেস করল।

“না।”

“তা হলে মতটা কীভাবে জানলেন?”

হরিহর উত্তর দেওয়ার আগে হরেন বলল, “আমি সকালে তাঁকে বলেছি।”

“আর কিছু বলেছ?”

“পাঁচ বিন্দুর কথা।”

কুসুম চুপ করল। বিনাপিসির বক্তব্য তাই নতুন সূত্র নয়। তবু পিতলের পিনের সঙ্গে মোড়লবাড়ির নথির সম্ভাব্য যোগ রইল।

সভা শেষের দিকে ভোলা দা দাঁড়িয়ে নিজেই নিজের শাস্তির প্রস্তাব দিলেন। “এক সপ্তাহ আমি হাটতলায় বসে সবাইকে সত্য ঘটনা বলব। চায়ের টাকা অবশ্য যার যার।”

হরিহর বললেন, “চায়ের টাকা তুমিই দেবে।”

“তা হলে মানুষ বেশি আসবে। গুজব কমবে না।”

সুধীর বলল, “গুজবের সঙ্গে চায়ের বিক্রি বাড়ে। কিন্তু ধারও বাড়ে। তুমি অর্ধেক দাও।”

দীর্ঘ আলোচনার পরে সিদ্ধান্ত হলো, ভোলা দা তিন দিন চা দেবেন এবং তিন দিন নিজের লেখা কাগজটি দোকানের সামনে ঝুলিয়ে রাখবেন। সপ্তম দিন তিনি শিশুদের গল্প বলবেন, তবে আগে কুসুম গল্পের শেষে অতিরিক্ত ভূত আছে কি না দেখে দেবে।

প্রথম চিঠির বিষয়ে তিনজনের অনুসন্ধান দল গঠিত হলো। কুসুম, জগন্নাথ ও হরেন। হরিহর নিজেকে তত্ত্বাবধায়ক ঘোষণা করতে চাইলেন। কুসুম বলল, “যাঁর বাড়িতে চিঠি এসেছে, তিনি সাক্ষীও। সাক্ষী নিজের তদন্ত তত্ত্বাবধান করলে প্রশ্ন উঠবে।”

হরিহর গোঁফে হাত দিলেন। “গ্রামে নতুন নিয়ম হচ্ছে?”

“পুরনো নিয়মে প্রশ্ন ছিল না বলেই নতুন নিয়ম দরকার।”

জগন্নাথ কুসুমকে থামাতে চেয়েও থামালেন না। পঞ্চানন মৃদু হাসলেন। মাখন সুতো গুটিয়ে নিল। মহিম সর্দার দূর থেকে হরিহরের দিকে তাকাল, কিন্তু তাদের চোখাচোখি হতেই অন্যদিকে ফিরল।

সভা ভাঙার পরে হাটতলার ধুলোয় একটি অদ্ভুত দাগ দেখা গেল। বটগাছের পশ্চিম শিকড় থেকে দক্ষিণের পুরনো খালের দিকে সরু রেখা। কেউ যেন ভেজা লাঠি টেনে নিয়ে গেছে। বৃষ্টি থামার পরেও রেখাটি ভেজা।

হরেন বলল, “কারও ছাতার ডগা।”

কুসুম হাঁটু গেড়ে কাদা ছুঁয়ে দেখল। আঙুলে নীলচে রং লাগল। গোলাপীর পায়ের কাদার মতো।

সুধীর দোকান বন্ধ করতে করতে বলল, “আজ ভোরে বটগাছের নিচে কে ছিল জানি না। তবে রাতের শেষে একবার টিনের ওপর আলো পড়েছিল। যেন কেউ খালের দিক থেকে লণ্ঠন নিয়ে ফিরছে।”

জগন্নাথ বললেন, “বৃষ্টিতে লণ্ঠন?”

সুধীর কাঁধ ঝাঁকাল। “আমি যা দেখেছি বললাম। আলো যুক্তিবাদী ছিল কি না, সেটা খেয়াল করিনি।”

* * *

৪ • পূর্ণিমার আগে

পরের তিন দিন পঞ্চগ্রামের কাজকর্মের ওপর চিঠির ছায়া পড়ল। মাঠে ধানরোপণ থামল না, হাটে সবজি বিক্রি হলো, স্কুলে উপস্থিতি অর্ধেক রইল, শিবু ওষুধ দিল, মাখন সুতো বিক্রি করল। তবু প্রতিটি কাজের মধ্যে একবার করে পূর্ণিমা ঢুকে পড়ল।

পটলপাড়ার কৃষকেরা বলল, দুর্ঘটনা হলে ফসলের হবে। বাজারপাড়ার ব্যবসায়ীরা বলল, হাটের হবে। মোল্লাপাড়ার মদন বলল, কোনো বিয়ে ভাঙবে। তার যুক্তি ছিল, গ্রামের বড় দুর্ঘটনা বলতে সাধারণত বিয়ে অথবা বর্ষা। কলাবাগানের মানুষ বলল, জল পুরনো পথ চাইবে কথাটি তাদের পাড়ার জন্যই লেখা। কারণ বর্ষায় প্রথম জল ওঠে তাদের উঠোনে, অথচ সিদ্ধান্ত হয় মোড়লপাড়ায় বসে।

কুসুম, জগন্নাথ ও হরেন প্রথমে চিঠির কালি পরীক্ষা করল। জগন্নাথ স্কুলের বিজ্ঞান বাক্স থেকে লেন্স আনলেন। বাক্সে ছিল একটি মরচেধরা কম্পাস, দুইটি কাচের নল, লাল নীল কাগজ এবং এমন একটি ব্যাটারি যা বহুদিন আগে কাজ বন্ধ করেছে।

“আমাদের বিজ্ঞান কোণ যদি সত্যিই থাকত, কিছু পরীক্ষা করা যেত,” তিনি বললেন।

কুসুম বলল, “চিঠির লেখক বিজ্ঞান কোণের অভাবের সুবিধা নেয়নি। সে জানত সবাই ভয় পাবে।”

হরেন বলল, “কালি বাজারের সস্তা কালো কলমের। আমি তিন দোকানে দেখেছি।”

“তুমি কখন গেলে?” জগন্নাথ জিজ্ঞেস করলেন।

“সকালে।”

“আমাদের না বলে?”

“তদন্তে দ্রুততা দরকার।”

কুসুম বলল, “দ্রুততা আর একা কাজ এক নয়।”

হরেন ঠোঁট বাঁকাল। “তুমি একা পিন নিয়ে পঞ্চাননের বাড়ি যাওনি?”

কুসুম থেমে গেল। সত্যিই সে আগের বিকেলে পঞ্চাননের কাছে গিয়েছিল। পঞ্চানন তাঁর কাঠের বাক্স থেকে কয়েকটি পুরনো আমন্ত্রণপত্র দেখিয়েছিলেন। কোনো পিনের মাথায় পাঁচ গর্ত নেই। তবে একটি বিয়ের গানে পাঁচ কড়ির উল্লেখ ছিল। কুসুম কাউকে বলেনি, কারণ নিশ্চিত কিছু পায়নি।

জগন্নাথ দুজনের দিকে তাকিয়ে বললেন, “তদন্ত দল গঠনের সঙ্গে সঙ্গে দল ভেঙে গেলে হরিহর খুশি হবে।”

হরেন বলল, “কাকা খুশি হলে গোঁফের ডান দিক ওঠে।”

“আজকাল তুমি মানুষের গোঁফ পড়ো?”

“কুসুমের কাছ থেকে শিখছি।”

কুসুম উত্তর দিল না। তার চোখ জানালার বাইরে। স্কুলের মাঠের পশ্চিম প্রান্তে গোলাপী হাঁটছিল। ডান পায়ের নীল ফিতা কাদায় টেনে যাচ্ছে। হাঁসটির মালিকের বাড়ি উত্তর দিকে, কিন্তু সে বারবার পশ্চিমে কেন আসে?

তিনজন গোলাপীর পেছনে গেল। গোলাপী প্রথমে স্কুলের পুকুরে নামল, তারপর জল ঝেড়ে কলাবাগানের পথ ধরল। পথে গোপাল কর্মকারের উঠোনে ঢুকে ভাঙা লাঙলের পাশে ঠোঁট দিল। গোপাল হাঁসটিকে দেখে বলল, “আমার দিকে তাকিও না। আজ রান্না ডাল।”

হরেন হেসে বলল, “কেউ আপনাকে সন্দেহ করেনি।”

“সন্দেহ করার আগে বলে রাখলাম।”

গোলাপী এরপর বাঁশঝাড় পেরিয়ে পুরনো খালের মুখে গেল। একসময় খালটি নাকি বর্ষার জল নিয়ে পশ্চিমের বিলের দিকে চলে যেত। এখন মুখ মাটি, কচুরিপানা আর

আবর্জনায় বন্ধ। তার ওপর নতুন করে লালচে মাটি ফেলা হয়েছে। নীল কাদা বেরিয়ে আছে নিচে।

কুসুম বলল, “নতুন মাটি কে ফেলেছে?”

গোপাল, যে কৌতূহলে তাদের পেছনে এসেছে, বলল, “মহিমের লোকজন। গুদামের জায়গা দেখছে। বলেছিল রাস্তা উঁচু করবে।”

জগন্নাথ কপাল কুঁচকালেন। “খালের মুখে রাস্তা উঁচু করলে জল যাবে কোথায়?”

গোপাল বলল, “জলকে জিজ্ঞেস করেনি।”

হরেন ফোনে ছবি তুলল। ছবিতে কাদা, হাঁস এবং তিনজনের পায়ের আঙুল বেশি দেখা গেল, খালের মুখ কম। সে আবার তুলল।

ঠিক তখন গোলাপী মাটির ঢিবির পেছনে ঢুকে গেল। তারা ঘুরে গিয়ে দেখল, পুরনো ইটের ফাঁকে একটি সরু গর্ত। ভেতর থেকে ঠান্ডা বাতাস আসছে। গোলাপী ঠোঁট ঢুকিয়ে কিছু টানছিল। একটি নীল কাপড়ের টুকরো বেরোল, তারপর কালো সুতো।

কুসুম কাপড়টি চিনল না। কিন্তু কালো সুতোর সঙ্গে লাল রঙ লেগে ছিল। মাখনের সুরক্ষা পুঁটলির সুতোও এমন।

জগন্নাথ বললেন, “এটা প্রমাণ নয়।”

“আমি কিছু বলিনি,” কুসুম উত্তর দিল।

“তোমার মুখ বলেছে।”

“মুখকে সাক্ষী করা যাবে না।”

সেই সন্ধ্যায় হাটতলায় ভোলা দার তৃতীয় দিনের চা চলছিল। তিনি নিজের নকল চিঠির কথা এমনভাবে বলছিলেন যেন সাহসী স্বীকারোক্তি দিয়ে গ্রামকে বাঁচিয়েছেন। কুসুম খালের ছবিগুলো দেখাতেই হরিহর বললেন, “মহিম রাস্তা করলে গ্রামেরই সুবিধা হবে।”

“জল আটকে গেলে?” জগন্নাথ জিজ্ঞেস করলেন।

“পুরনো খাল বহু বছর বন্ধ। কিছু হয়নি।”

কলাবাগানের এক বৃদ্ধা বললেন, “কিছু হয়নি মোড়লপাড়ায়। আমাদের ঘরে হাঁটু জল হয়েছে।”

হরিহর তাঁর কথা শুনলেন, কিন্তু উত্তর দিলেন না। মহিম সর্দার পাশ থেকে বলল, “গুদাম হলে কাজ হবে, বাজার বাড়বে। ভয় দেখিয়ে উন্নয়ন থামানো ঠিক নয়।”

কুসুম বলল, “ভয় দেখাচ্ছে কে, সেটা আমরা এখনও জানি না। কিন্তু খালের ওপর মাটি ফেলার অনুমতি কে দিয়েছে, সেটা জানা সহজ।”

মহিম মৃদু হাসল। “মেয়েটা আজকাল অনেক প্রশ্ন করে।”

চন্দনা, কুসুমের মাসি, ভিড়ের পেছন থেকে বললেন, “প্রশ্নের ওজন বয়স দেখে কমে না।”

আলোচনা থেমে গেল।

রাতে বৃষ্টি হলো না। আকাশে মেঘ সরে অর্ধেক চাঁদ দেখা দিল। পূর্ণিমা তখনও দূরে। তবু মধ্যরাতে কলাবাগানের কয়েকজন পুরনো খালের দিক থেকে আলো দেখল। আলোটি স্থির নয়, মাটির কাছাকাছি এগিয়ে আবার অদৃশ্য হলো। কেউ বলল লণ্ঠন, কেউ বলল আগুনের গোলা।

হরেন বাড়ির ছাদ থেকে দেখতে পেয়ে কুসুমকে ফোন করল। তিনবার চেষ্টা করে সংযোগ পেল।

“আলো খালের দিকে,” সে বলল।

“যেও না একা।”

“আমি একা নই। গোলাপীও যাচ্ছে।”

কুসুমের উত্তর আসার আগেই ফোন কেটে গেল।

হরেন নিচে নেমে উঠোনে পৌঁছল। গোলাপী সত্যিই সদর দরজার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে গেছে। সে লাঠি আর টর্চ নিয়ে পেছনে চলল। বাঁশবনের কাছে গিয়ে টর্চ একবার নিভে গেল। আবার জ্বালতেই দূরে সাদা পালক দেখা গেল, তারপর নীল ফিতার ঝলক।

খালের মুখের কাছে আলোটি হঠাৎ নিচু হলো। মানুষের ছায়া দেখা গেল না। শুধু মাটিতে ধাতব কিছু ঘষার শব্দ। হরেন ডাকল, "কে?"

শব্দ থেমে গেল।

সে আরেক ধাপ এগোতেই পায়ের নিচে কাদা সরে গেল। ভারসাম্য হারিয়ে বসে পড়ল। টর্চ দূরে ছিটকে নিভে গেল। অন্ধকারে গোলাপীর ডানা ঝাপটানোর শব্দ, তারপর খুব নিচু একটি কণ্ঠ। কথাটি স্পষ্ট নয়, শুধু শেষ দুটি শব্দ শোনা গেল।

"হিসাব মেলাও।"

হরেন উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে দেখল, আলোটি পুরনো বটগাছের দিকে সরে যাচ্ছে। সে দৌড়াল না। কারণ হাঁটুর ব্যথা ছিল, এবং প্রথমবার তার মনে হলো ভোলার গল্পের মধ্যে ঢুকে পড়া যতটা আনন্দের, বেরিয়ে আসা ততটা সহজ নয়।

ভোরে গোলাপী একাই মোড়লবাড়িতে ফিরল। তার নীল ফিতায় নতুন একটি পিতলের কণা আটকে ছিল। কণাটির এক পাশে খোদাই করা পাঁচটি বিন্দু।

* * *

সত্য হাঁটে নিজের পায়ে, গুজব চড়ে অন্যের কাঁধে।

৫. গোলাপীর অন্তর্ধান

গোলাপী হারিয়ে গেল পূর্ণিমার পাঁচ সপ্তাহ আগে, এমন এক সকালে যেদিন হরিহর মোড়লের মন অন্য কারণে খারাপ ছিল। ব্লক অফিস থেকে একটি নোটিশ এসেছে। পুরনো খালের ধারের জমি নিয়ে আবেদন জমা পড়েছে, এবং জমির শ্রেণি বদলের বিষয়ে গ্রামসভায় মতামত চাইছে। নোটিশটি পড়তে পড়তে হরিহর একবার মহিম সর্দারের নাম দেখলেন, একবার জানালার বাইরে বন্ধ খালের দিকে তাকালেন। তারপর কাগজ ভাঁজ করে আলমারিতে রেখে দিলেন।

ঠিক তখনই দাসু হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বলল, "গোলাপী নেই।"

হরিহর প্রথমে কথাটা বুঝতে পারলেন না। "কী নেই?"

"হাঁসটা। পুকুরে নেই, খোঁয়াড়ে নেই, উঠোনেও নেই।"

মোড়লবাড়ির মানুষ হারালে এত দ্রুত ভিড় হয় কি না জানা নেই, কিন্তু হাঁস হারাতেই দশ মিনিটে চার পাড়ার লোক এসে গেল। বাজারপাড়া একটু পরে, কারণ সেখানকার মানুষ প্রথমে জানতে চায় ঘটনাটি কেনাকাটার সুযোগ তৈরি করছে কি না।

ভোলা দা ঘোষণা করলেন, "এটা সাধারণ হাঁসচুরি নয়। চিঠি, নীল কাদা, পিতলের কণা, তারপর হাঁস উধাও। সব এক সূত্রে বাঁধা।"

গোপাল কর্মকার দূর থেকে বলল, "আমার দিকে তাকিও না। গতকাল বাজার থেকে কাতলা এনেছি।"

হরিহর বললেন, "কে তোমার দিকে তাকিয়েছে?"

"সবাই মনে মনে তাকাচ্ছে।"

কুসুম গোলাপীর খোঁয়াড় দেখল। বাঁশের দরজা ভাঙা নয়। ফাঁক দিয়ে হাঁস বেরোতে পারে, কিন্তু সাধারণত গোলাপী রাতে বেরোয় না। নীল ফিতার একটি সুতো বাঁশে

আটকে আছে। মাটিতে গোলাপীর পায়ের ছাপ, তার পাশে মানুষের চটির দাগ। চটির এক পাশ ক্ষয়ে গেছে, ফলে প্রতি ডান পায়ের ছাপে অর্ধচন্দ্রের মতো ফাঁক।

হরেন বলল, “মহিমের লোকজনের চটি সব একরকম।”

“গ্রামের অর্ধেক মানুষের চটিও একরকম,” কুসুম বলল। “আগে দাগের দিক দেখো।”

দাগ উঠোন থেকে পুকুরঘাট, সেখান থেকে উত্তর নয়, পশ্চিমে গেছে। কলাবাগানের রাস্তা। মাঝপথে বর্ষার জল জমে ছাপ মুছে গেছে। তার পরে কেবল সাদা পালকের দুইটি টুকরো।

হরিহর পালক দেখে এমন মুখ করলেন যেন পরিবারে শোক এসেছে। জগন্নাথ বললেন, “পালক পড়লেই আক্রমণ হয়েছে, এমন নয়। হাঁস নিজের পালকও ফেলে।”

“আপনি সবকিছু সহজ করেন,” হরিহর বললেন।

“সহজ আর যুক্তিসঙ্গত এক নয়।”

শিবু পাল পালক হাতে নিয়ে পরীক্ষা করতে চাইলেন। কুসুম থামাল। “হাতে নেবেন না। পরে দরকার হতে পারে।”

শিবু গম্ভীর হয়ে বললেন, “আমি চিকিৎসক।”

গোপাল বলল, “হাঁসেরও?”

শিবু তাকে উপেক্ষা করলেন।

খোঁজের দল ভাগ হলো। জগন্নাথ ও পঞ্চানন মোড়লপাড়ায়, গোপাল ও হরেন বাজারপাড়ায়, কুসুম ও চন্দনা কলাবাগানের দিকে। হরিহর নিজে উঠোনে বসে নির্দেশ দিতে লাগলেন। তিনি এত নির্দেশ দিলেন যে শেষে দাসু বুঝতে পারল না, খাল দেখবে না পুকুর।

কলাবাগানের বাঁশঝাড়ের কাছে চন্দনা থামলেন। “তুই গতকাল বলছিলি, গোলাপী খালের মুখে গিয়েছিল।”

“গিয়েছিল।”

“তা হলে সোজা ওখানে যাচ্ছিস না কেন?”

“যে নিয়ে গেছে সে চাইবে আমরা সোজা যাই। প্রথমে পাশের পথ দেখছি।”

চন্দনা হেসে বললেন, “তদন্তকারীর সঙ্গে তর্ক করা বিপজ্জনক।”

পথে তাঁরা খোকন মণ্ডলকে পেলেন। খোকন লোকের কথার মাঝখানে অন্য কথা বলেন, আবার এমন কিছু দেখেন যা অন্যরা দেখে না। তিনি বাঁশের কঞ্চি দিয়ে কাদা খুঁটছিলেন।

“হাঁস দেখেছ?” কুসুম জিজ্ঞেস করল।

খোকন বলল, “সাদা?”

“হ্যাঁ।”

“নীল পা?”

“পা নীল নয়, ফিতা নীল।”

“রাতে নীল পা দেখেছি। তার পেছনে অর্ধেক চাঁদ হাঁটছিল।”

চন্দনা কুসুমের দিকে তাকালেন। কুসুম নরম গলায় বলল, “অর্ধেক চাঁদ মানে?”

খোকন কাদায় চটির ছাপ আঁকল। ডান পাশে অর্ধচন্দ্রের ফাঁক। তারপর পশ্চিমে আঙুল দেখাল। “মানুষটা হাঁসকে কোলে নেয়নি। দড়ি ধরে টানছিল। হাঁস রাগ করছিল।”

“চেহারা?”

“লাল কাপড়। মুখে ছিল না।”

মাখনের সহকারীরা লাল গামছা পরে। আবার মহিমের গুদামের শ্রমিকদেরও লাল কাপড় দেওয়া হয়েছে। কুসুম এই দুটি তথ্য মনে রাখল।

খালের মুখে পৌঁছে দেখা গেল নতুন মাটির ওপর খোঁড়াখুঁড়ি হয়েছে। এক পাশে ছোট গর্ত, তার ভেতরে হাঁসের বিষ্ঠা এবং শামুকের খোল। গোলাপী এখানে ছিল। কাদায় দড়ি টানার দাগ পুরনো ইটের দিকে গেছে। ইট সরাতেই সরু এক নালা দেখা গেল। নালাটি একসময় খালের শাখা ছিল। এখন বাঁশ, প্লাস্টিক আর মাটিতে বন্ধ।

দূরে গোলাপীর কর্কশ ডাক শোনা গেল। সবাই দৌড়ে গেল। একটি পরিত্যক্ত কলাবাগানের ভেতর মাটির গর্তে সে আটকে আছে। পায়ে পাতলা দড়ি। দড়ির অন্য প্রান্ত বাঁধা কাঠের ছোট খুঁটিতে। পাশে একটি বস্তা, বস্তার ওপর মহিমের চালের আড়তের চিহ্ন।

হরেন ও গোপালও খবর পেয়ে এসে গেল। হরেন দড়ি খুলতে গিয়ে বলল, “এটা চুরি। কেউ লুকিয়ে রেখেছিল।”

কুসুম বস্তা তুলে দেখল, নিচে নীল কাদার সঙ্গে লাল মাটি মেশানো। কয়েকটি নতুন বাঁশের কঞ্চি। খালের মুখ বন্ধ করার কাজে এই মাটি ও বাঁশ ব্যবহার হয়েছে।

গোলাপী মুক্ত হয়ে প্রথমে হরেনের পায়ে ঠোকর দিল, তারপর গোপালের হাতে। গোপাল বলল, “আমি তো উদ্ধার করতে এসেছি।”

চন্দনা বললেন, “হাঁসের আদালতে সাক্ষী আর সন্দেহভাজনের পার্থক্য কম।”

মহিম সর্দারকে ডাকা হলো। তিনি বস্তা দেখে বললেন, তাঁর আড়তের বস্তা গ্রামে অনেকের ঘরে আছে। শ্রমিকদের কেউ হাঁস ধরে থাকলে তিনি জানেন না। খালের মুখে মাটি ফেলার বিষয়ে বললেন, পঞ্চায়েতের মৌখিক অনুমতি ছিল।

“কার?” কুসুম জিজ্ঞেস করল।

মহিম হরিহরের দিকে তাকাল। হরিহর বললেন, “রাস্তা মেরামতের কথা হয়েছিল। খাল বন্ধ করার নয়।”

“একই জায়গা,” মহিম বলল।

“মানচিত্রে একই কি না দেখতে হবে,” জগন্নাথ বললেন।

মহিম ঠান্ডা গলায় উত্তর দিল, “মানচিত্র থাকলে দেখুন।”

এই বাক্যটি বলা মাত্র পঞ্চানন বটগাছের দিকে তাকালেন। তাঁর ঠোঁটে পুরনো গানের একটি লাইন নড়ল, কিন্তু তিনি উচ্চারণ করলেন না।

গোলাপীকে কে বেঁধেছিল, সেই প্রশ্নের উত্তর সেদিন পাওয়া গেল না। খোকনের দেখা অর্ধচন্দ্র চটির মালিকও ধরা পড়ল না। তবে একটি বিষয় স্পষ্ট হলো। কেউ চাইছিল পুরনো খালের মুখে মানুষ না যাক, আর গোলাপী সেখানে গিয়ে যা দেখেছিল, তাকে সাময়িকভাবে সরিয়ে রাখা হয়েছিল।

হরিহর বাড়ি ফেরার সময় হাঁসটিকে কোলে নিতে গেলেন। গোলাপী ডানা ঝাপটে নেমে কুসুমের পেছনে হাঁটল। ভোলা দা বললেন, “প্রাণীরা সত্যবাদী মানুষ চিনতে পারে।”

কুসুম বলল, “গোলাপী একটু আগে গোপাল কাকার হাতেও ঠোকর দিয়েছে।”

“সত্যের প্রকাশ সবসময় কোমল হয় না,” ভোলা দা বললেন।

সেদিন সন্ধ্যায় সুধীর দোকানের খাতায় একটি নতুন লাইন লিখল: গোলাপী উদ্ধার, চা বারো কাপ, টাকা দিল কেউ না।

* * *

৬• শিবুর ওষুধ

চিঠি আর গোলাপীর রহস্যে গ্রামের মানুষ ব্যস্ত থাকলেও জ্বর তার সময় দেখে আসে না। আষাঢ়ের শেষে টানা বৃষ্টির পরে পটলপাড়ায় শিশুরা একে একে জ্বরে পড়ল। কেউ বলল বাতাসের দোষ, কেউ বলল পুকুরের, কেউ বলল পূর্ণিমার আগাম ছায়া। শিবু পাল বললেন, "ঋতু পরিবর্তনের জ্বর। আমার অভিজ্ঞতায় তিন রঙের ওষুধে দুই দিনে সেরে যায়।"

তিন রঙের ওষুধ বলতে তিনি তিনটি আলাদা শিশির তরল একটি বোতলে মিশিয়ে দিতেন। কোনটির নাম কী, কেউ জানত না। শিবু বলতেন, নাম জানলে রোগী ওষুধ নিয়ে তর্ক করে।

নিতাইয়ের আট বছরের মেয়ে ঝিলিকের জ্বর তৃতীয় দিনে বাড়ল। শরীর গরম, ঠোঁট শুকনো, বারবার বমি। নিতাই সকালে শিবুর কাছে নিয়ে গেলে তিনি নাড়ি দেখে বললেন, "পেটের বাত মাথায় উঠেছে।" তারপর একটি গোলাপি মিশ্রণ দিয়ে বললেন, জল কম খাওয়াতে। জল খেলে নাকি ওষুধের শক্তি পাতলা হয়।

দুপুরে কুসুম পড়াতে গিয়ে দেখল ঝিলিক অচেতন মতো শুয়ে আছে। ডাকার পর চোখ খুলছে, আবার বন্ধ করছে। শ্বাস দ্রুত। কুসুম নিতাইকে জিজ্ঞেস করল, "কতবার প্রস্রাব করেছে?"

নিতাই লজ্জিত গলায় বলল, "সকাল থেকে একবারও নয়।"

"জল?"

"শিবু বলেছে কম দিতে।"

কুসুমের গলা কঠিন হলো। "এখনই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিতে হবে।"

নিতাই দ্বিধা করল। স্বাস্থ্যকেন্দ্র তিন কিলোমিটার দূরে। ভ্যান লাগবে, টাকা লাগবে। শিবু শুনে ছুটে এলেন। বোতল দেখে বললেন, “ওষুধ কাজ করার আগে জ্বর একটু বাড়ে। শরীরের বিষ বেরোচ্ছে।”

জগন্নাথও খবর পেয়ে এলেন। ঝিলিকের কপাল ছুঁয়ে বললেন, “বিতর্ক পরে। আগে নিয়ে চলুন।”

শিবু আপত্তি করলেন, “আমার চিকিৎসা মাঝপথে বন্ধ করলে অবস্থা খারাপ হতে পারে।”

কুসুম তাঁর দিকে তাকিয়ে বলল, “অবস্থা ইতিমধ্যে খারাপ। আপনি সঙ্গে চলুন। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আপনার কথাও বলবেন।”

শিবু এমন প্রস্তাব আশা করেননি। তিনি রোগীকে শহরে পাঠাতে চান না, আবার সামনে দাঁড়িয়ে না বলতেও পারলেন না। সুধীরের দোকান থেকে ভ্যান ডাকা হলো। হরেন ফোনে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে খবর দেওয়ার চেষ্টা করল। প্রথম তিনবার নম্বর লাগল না। চতুর্থবার এক কর্মী ধরলেন এবং দ্রুত আনতে বললেন।

ভ্যানের ওপর ঝিলিককে শুইয়ে কুসুম তার ঠোঁটে অল্প অল্প জল দিল। শিবু বললেন, “একসঙ্গে বেশি নয়।”

কুসুম বলল, “এবার ঠিক কথা বলেছেন।”

শিবুর মুখে ক্ষীণ অপমান ফুটল, কিন্তু তিনি চুপ করলেন।

স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসক জানালেন, ঝিলিকের তীব্র পানিশূন্যতা হয়েছে এবং সংক্রমণের লক্ষণ আছে। স্যালাইন, পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ দরকার। আর একটু দেরি হলে খিঁচুনি বা আরও বড় বিপদ হতে পারত। শিবুর বোতলের উপাদান জানতে চাইলে তিনি বললেন, “নিজস্ব মিশ্রণ।”

চিকিৎসক বোতলটি রেখে দিলেন। “নিজস্ব মিশ্রণ শিশুকে না দেওয়াই ভালো। প্রেসক্রিপশন ছাড়া এই ধরনের ওষুধ দেওয়া আইনসঙ্গতও নয়।”

শিবুর গলা শুকিয়ে গেল। বাইরে এসে তিনি দীর্ঘ সময় কথা বললেন না। জগন্নাথ ভেবেছিলেন, এবার হয়তো তিনি যুক্তির ভাষণ দেবেন। কিন্তু কুসুম চোখের ইশারায় থামাল। অপমানিত মানুষকে শিক্ষা দিতে গেলে কখনো কখনো শিক্ষা নয়, রাগই বাড়ে।

ঝিলিক রাতে কিছুটা সুস্থ হলো। নিতাই বাড়ি ফিরে সবার সামনে শিবুকে গাল দিতে চাইলে কুসুম বলল, “রাগ তোমার অধিকার। কিন্তু কাল থেকে গ্রামের জ্বরের শিশুদের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করো। শুধু শিবুকে অপমান করলে পরের রোগী বাঁচবে না।”

এই কথা হাটতলায় পৌঁছতে পৌঁছতে দুই ভাগ হলো। একদল বলল, শিবুর ওষুধে বিষ পাওয়া গেছে। অন্যদল বলল, শহরের ডাক্তার শিবুর প্রতিভা দেখে ভয় পেয়েছে। শিবু নিজে কোনো বক্তব্য দিলেন না। তাঁর দোকানের সামনে তিন দিন স্টেথোস্কোপ ঝোলেনি।

চতুর্থ দিন তিনি আবার বসে বললেন, “আমি তো কাউকে জোর করি না।”

সুধীর চা দিতে দিতে বলল, “ভয় দেখিয়ে জল বন্ধ করাও জোরের এক রকম।”

শিবু কাপের দিকে তাকালেন। “আমি ভুল বুঝেছি।”

সুধীর বলল, “এই কথাটা জ্বরের ওষুধের চেয়ে বেশি দামী। তবে একবার বললে কাজ শেষ হয় না।”

জগন্নাথ পরে কুসুমকে বললেন, “তুমি ওকে প্রকাশ্যে ধরলে না কেন?”

“কারণ ঝিলিকের চিকিৎসা দরকার ছিল, শিবুর বিচার নয়।”

“ভুল চিকিৎসা সামাজিক বিপদ।”

“হ্যাঁ। কিন্তু মানুষকে এমনভাবে কোণঠাসা করলে সে পরেরবার ভুল লুকাবে।”

জগন্নাথ কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, “তুমি সবসময় ঠিক নও।”

“আপনিও নন।”

“আমি জানি।”

কুসুম হেসে ফেলল। “এই কথাটা লিখে রাখব?”

জগন্নাথও অল্প হাসলেন। “অতিরিক্ত প্রমাণ সংগ্রহ কোরো না।”

সেই বিকেলে বিনাপিসি ঝিলিকের জন্য পাতলা ভাত পাঠালেন। পাত্রের তলায় কুসুম একটি ভাঁজ করা কাগজ পেল। তাতে কোনো নাম নেই, শুধু লেখা: “যে জল থামায়, সে জ্বর আর বন্যা দুটোই ডাকে।” হাতের লেখা প্রথম চিঠির মতো কি না, কুসুম নিশ্চিত হতে পারল না। অক্ষর ছোট, কালি নীল। কিন্তু “জল থামায়” শব্দ দুটি তার মনে গেঁথে রইল।

* * *

পঞ্চগ্রামের পুরনো তালগাছটি মন্দিরের পাশে হলেও তার মালিকানা নিয়ে তিনটি মত ছিল। পঞ্চানন বলতেন গাছটি দেবোত্তর জমির। হরিহর বলতেন মোড়ল পরিবারের সীমানায়। গোপাল বলতেন গাছের মাথায় যে মৌচাক, তার মালিক মৌমাছি। এই তিন মতের কোনোটিই মৌমাছিদের আচরণে প্রভাব ফেলেনি।

এক রাতে বাজার থেকে ফিরতে গিয়ে মাধব মণ্ডল তালগাছের দিক থেকে দীর্ঘ কান্নার মতো শব্দ শুনল। প্রথমে “উউউ”, তারপর ধাতব ঠং, তারপর নিচু গলায় “ফিরে যা।” মাধব লাঠি ফেলে দৌড়াল। বাড়িতে পৌঁছে বলল, গাছের মাথায় মুখহীন মানুষ বসেছিল।

পরদিন ভোরে মুখহীন মানুষটির সঙ্গে সাদা কাপড়, আগুনের চোখ এবং দশ হাত লম্বা বাহু যোগ হলো। দুপুরের মধ্যে মাখন ঠাকুর তালগাছের নিচে ধূপ জ্বালিয়ে জানালেন, জায়গাটি অশান্ত। তিনি চাইলে তিন রাতে শান্ত করতে পারেন। খরচ পরিবারপিছু আলাদা।

পঞ্চানন আপত্তি করলেন। “কোনো জায়গা অশান্ত বলার আগে কারণ দেখো।”

মাখন নরম গলায় বলল, “সব কারণ চোখে দেখা যায় না।”

“তা হলে তোমার ফি চোখে দেখা যায় কেন?”

এই প্রশ্নে ভিড় নড়েচড়ে উঠল। পঞ্চানন সাধারণত মাখনের সঙ্গে সরাসরি ঝগড়া করেন না। আজ তাঁর কণ্ঠ শক্ত।

জগন্নাথ বললেন, “রাতে গিয়ে শব্দের উৎস দেখা হবে।”

শিবু সঙ্গে সঙ্গে বললেন, “শব্দে মানুষের স্নায়ু ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। তুলো নিয়ে যাব।”

হরেন বলল, “শব্দ না শুনলে উৎস খুঁজব কীভাবে?”

“এক কানে তুলো।”

“ভূত কি ডান কানে কথা বলে?”

শিবু উত্তর দেওয়ার আগে সবাই হেসে ফেলল। তিনি গম্ভীর থাকলেন।

রাতের দলে ছিল কুসুম, হরেন, জগন্নাথ, পঞ্চানন, গোপাল এবং শিবু। হরিহর যাওয়ার কথা বলেও শেষে পেটের অসুবিধার কথা জানালেন। ভোলা দা বললেন, তাঁর হাঁটু রাতের শিশির সহ্য করে না, তবে দূর থেকে নির্দেশ দেবেন। নির্দেশ দেওয়ার জন্য তিনি সুধীরের দোকানে বসে রইলেন।

চাঁদ মেঘে ঢাকা। তালপাতা বাতাসে ঘষে শুকনো কাগজের মতো শব্দ করছে। দূরে কুকুর ডেকেছিল, হঠাৎ থেমে গেল। কুসুম সবাইকে আলো নিচু রাখতে বলল। তারা তালগাছ থেকে কিছু দূরে ঝোপের আড়ালে বসল।

প্রথম আধঘণ্টা কিছু হলো না। গোপাল ফিসফিস করে বলল, “ভূতও হয়তো সভার সময় মানে না।”

পঞ্চানন বললেন, “চুপ।”

তারপর গাছের মাথা থেকে দীর্ঘ “উউউ” শব্দ এল। শিবু এক কানে তুলো ঢোকাতে গিয়ে দু কানেরই ফেললেন। হরেন ফোনের শব্দ রেকর্ড চালু করল। দ্বিতীয় শব্দটি ধাতব। তৃতীয়টি স্পষ্ট, “ফিরে যা।”

গোপাল উঠে পড়েছিল। কুসুম তার হাত ধরল। “মানুষের গলা।”

“মানুষও ভয় দেখাতে পারে,” গোপাল বলল।

হরেন টর্চ জ্বালতেই গাছের ডালে কিছু নড়ল। সাদা কাপড় নয়, বাঁশের পাতলা ফালি। নিচে দড়ি টানা। তারা দড়ির দিক ধরে এগিয়ে একটি ঝোপের পেছনে মাখনের সহকারী কানাইকে পেল। তার হাতে বাঁশের নল। বাতাস ঢুকলে নল থেকে কান্নার শব্দ হয়, আর সুতো টানলে টিনের পাত গাছে লেগে ঠং করে। “ফিরে যা” কথাটি সে নিজে বলছিল।

কানাই প্রথমে বলল, মাখন কিছু জানে না। পরে বলল, লোকজন রাতে খালের দিকে গেলে বিপদ হতে পারে বলে ভয় দেখানো হয়েছে। কে বলেছে, সে জানে না। আরও পরে বলল, মহিমের আড়তের এক লোক তাকে দুই টাকা আর ভাত দিয়েছিল।

জগন্নাথ ক্ষুব্ধ হলেন। "এটা প্রতারণা। থানায় জানাতে হবে।"

পঞ্চানন বললেন, "আগে সব শুনুন।"

ঠিক তখন তালগাছের ওপরে থেকে আরেকটি চিৎকার। এইবার শব্দে কথা নেই, সত্যিকারের ব্যথা। আলো ফেলতেই দেখা গেল গহর গাছের গায়ে ঝুলছে। কোমরে দড়ি, হাতে ধোঁয়া দেওয়া কাপড়। সে মৌচাক থেকে মধু নিতে উঠে মৌমাছির কামড়ে বিপদে পড়েছে।

শিবু তুলো ফেলে দৌড়ালেন। গহরকে নামাতে গোপাল ও হরেন গাছে উঠল। নিচে নামার পরে তার মুখ ফুলেছে, শ্বাস নিতে কষ্ট। শিবু প্রথমে ব্যাগ খুলে পুরনো একটি ইনজেকশন বের করলেন, তারপর ঝিলিকের কথা মনে পড়ে থেমে গেলেন।

"স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিতে হবে," তিনি বললেন। "এটা মারাত্মক অ্যালার্জি হতে পারে।"

জগন্নাথ তাঁর দিকে তাকালেন। শিবু বললেন, "আমার কাছে যা আছে, যথেষ্ট নয়।"

ভ্যান ডাকা হলো। শিবু নিজে সঙ্গে গেলেন।

তালগাছের দুটি রহস্য সেদিনই ব্যাখ্যা হলো। কানাইয়ের বাঁশের নল, গহরের চিৎকার। তবু ভোরে হরেন রেকর্ড শুনতে গিয়ে শেষে একটি ক্ষীণ শব্দ পেল। সবাই তালগাছ ছেড়ে যাওয়ার পরে, প্রায় এক মিনিটের নীরবতার মধ্যে দূরে একটি পুরনো ঘণ্টা একবার বেজেছে। সেখানে কোনো ঘণ্টা নেই। পঞ্চানন বললেন, বাতাসে দূরের গরুর ঘণ্টা ভেসে আসতে পারে। জগন্নাথ বললেন, রেকর্ডারের বিকৃতি। কুসুম কিছু বলল না।

কানাইকে জনতার সামনে মারার দাবি উঠেছিল। পঞ্চানন বাধা দিলেন। “ভয় বিক্রি করেছে যে, তাকে ধরুন। পয়সার জন্য দড়ি টানা ছেলেকে পিটিয়ে প্রতারণা বন্ধ হবে না।”

মাখন ঠাকুর পরদিন দাবি করল, কানাই তার নাম ব্যবহার করেছে। মহিমও সব অস্বীকার করল। প্রমাণ বলতে কানাইয়ের কথা এবং বাঁশের যন্ত্র। পুলিশে অভিযোগ হয়নি, কিন্তু মাখনের বিক্রি কয়েকদিন কমল।

ভোলা দা নতুন গল্প শুরু করলেন, তিনি নাকি প্রথম থেকেই জানতেন ভূতের গলা বাঁশের। সুধীর জিজ্ঞেস করল, “জানলে রাতে গেলে না কেন?”

ভোলা দা বললেন, “তদন্তকারীদের স্বাধীনতা দিয়েছি।”

হরেন রেকর্ডের শেষ ঘণ্টাটি কুসুমকে শোনাল। কুসুম দীর্ঘক্ষণ শুনে বলল, “এখন রেখে দাও। সবকিছুর তৎক্ষণাৎ নাম দরকার নেই।”

“তুমি রহস্য রেখে দিতে শিখছ?”

“তুমি রেকর্ড ঠিকমতো রাখতে শিখছ।”

হরেন ফোনটি সাবধানে পকেটে রাখল। এই প্রশংসা সে প্রকাশ্যে পায়নি, তবু মুখে এমন ভাব এল যেন বাজারপাড়ায় দোকানের জায়গা পেয়ে গেছে।

* * *

৮. রামলোচনের সিদ্ধান্ত

রামলোচন মণ্ডল বিয়ে করবেন, খবরটি প্রথম বলেছিলেন তিনি নিজে। কিন্তু হাটতলায় পৌঁছতে পৌঁছতে খবর হলো, তাঁকে পাঁচ পাড়ার সম্মিলিত উদ্যোগে বিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বিকেলের মধ্যে পাত্রীও তিনজন হয়ে গেলেন। একজন পাশের গ্রামের বিধবা মায়া, একজন নাকি শহরের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা, আর তৃতীয়জনের নাম কেউ জানে না, শুধু বলা হলো তিনি খুব রান্না জানেন।

রামলোচনের বয়স ছাপ্পান্ন। তিনি একা থাকেন, ধানের ছোট ব্যবসা করেন, রান্নাঘরে ঢুকলে ধোঁয়ায় চোখে জল আসে। বহু বছর আগে চন্দনার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল, কিন্তু পরিবারের দায়, অসুস্থ বাবা মা এবং সামাজিক আপত্তিতে বিয়ে হয়নি। এখন দুজনেই সেই ইতিহাস নিয়ে প্রকাশ্যে কথা বলেন না।

হাটতলায় ভোলা দা বললেন, “রামলোচনের বিয়ে জরুরি। মানুষের বয়স হলে দেখাশোনার লোক লাগে।”

চন্দনা ঠিক তখন মশলার প্যাকেট দিতে সুধীরের দোকানে এসেছিলেন। তিনি প্যাকেট নামিয়ে বললেন, “লোক লাগলে মজুরি দিয়ে লোক রাখুক। বিয়ে কেন?”

ভোলা দা কাশলেন। “আমি সঙ্গীর কথা বলছিলাম।”

“সঙ্গী আর পরিচারিকার কাজ আলাদা করে বললে ভুল কম হয়।”

সুধীর চায়ের কাপ ধুতে ধুতে মুখ নিচু করল।

রামলোচনকে ডাকা হলো। তিনি এসে বললেন, “আমি একা থাকি। সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে কথা বলার মানুষ নেই। অসুখ হলে জল দেওয়ার কেউ নেই।”

চন্দনা জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি অসুখ করলে জল দেবে কে, সেটা ভাবছ। অন্যজন অসুখ করলে জল দেবে কে?”

রামলোচন থামলেন। “আমি দেব।”

“রান্না?”

“শিখব।”

“আমার মশলার কাজ?”

“চলবে।”

“আমার টাকা?”

“তোমার।”

“আমার বাড়ি?”

“তুমি চাইলে থাকবে।”

এই সংলাপের সময় হাটতলার লোকজন এমন চুপ ছিল, যেন পঞ্চায়েতের বাজেট পড়া হচ্ছে। হরিহর বললেন, “এগুলো বাড়ির মধ্যে ঠিক করা যায়।”

চন্দনা তাঁর দিকে তাকালেন। “বাড়ির মধ্যে ঠিক করা কথা বাইরে এসে বদলে যায়। তাই বাইরে বলছি।”

কুসুম মাসির মুখে কোনো লজ্জা দেখল না। ছিল দীর্ঘদিনের হিসাব মেলানোর শান্ত প্রস্তুতি। তার মনে পড়ল, চন্দনা একা হাতে সংসার চালিয়েছেন, মায়ের চিকিৎসায় টাকা দিয়েছেন, কুসুমের কলেজের প্রথম ভর্তি ফি জমিয়েছেন। তাঁকে শুধু কারও বউ হিসেবে দেখা কত সহজ।

মায়ার ভাই বিষ্ণুপদও খবর শুনে এলেন। তিনি রেগে বললেন, “আমার বোনকে না জিজ্ঞেস করে নাম ঘোরাচ্ছেন কেন?”

পেছন থেকে মায়া নিজেই বললেন, “আমাকে জিজ্ঞেস করলে আমি না বলতাম। কিন্তু তোমার রাগ আমার হয়ে দেখানোর দরকার নেই।”

হাটতলার পুরুষদের মধ্যে সামান্য অস্বস্তি ছড়িয়ে পড়ল। দুই নারী একই দিনে নিজের সিদ্ধান্ত নিজে বলছেন, এটি পঞ্চগ্রামের অভ্যাসে ছিল না।

রামলোচন শেষে বললেন, “চন্দনা রাজি হলে আমি বিয়ে করতে চাই। না হলে কাউকে শুধু ঘর দেখার জন্য আনব না।”

চন্দনা বললেন, “রাজি হওয়ার আগে তিন মাস আমরা নিয়মিত কথা বলব। তোমার রান্না শেখা দেখব। আমার কাজ বন্ধ হবে না। কুসুম বা অন্য কারও ওপর আমাদের সংসারের কাজ চাপবে না। তারপর সিদ্ধান্ত।”

ভোলা দা ফিসফিস করে গোপালকে বললেন, “এখন বিয়েরও পরীক্ষাকাল।”

গোপাল বলল, “লাঙল কিনলেও আগে মাটি দেখে।”

কুসুম শুনে হাসল। হাসি বয়সকে নিয়ে নয়, রামলোচনের মুখের গম্ভীরতায়। তিনি যেন জীবনের সবচেয়ে কঠিন চুক্তিপত্র পড়ছেন।

সভা ভাঙার পরে চন্দনা কুসুমকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফিরলেন। পথে বললেন, “তুই কী ভাবছিস?”

“তুমি যা ঠিক করবে।”

চন্দনা থামলেন। “এই কথাটা বলিস না। আমি যদি তোকে বলি, তুই যা ঠিক করবি, তোর কেমন লাগবে?”

কুসুম বুঝল, উৎসাহের আড়ালেও সিদ্ধান্ত ঠেলে দেওয়া যায়। সে বলল, “আমি চাই তুমি নিজের কাজ আর সম্মান রেখে সুখী হও। রামলোচন সেটা বুঝতে পারলে ভালো।”

“এবার ঠিক বলেছিস।”

বাড়িতে ফিরে চন্দনা পুরনো একটি টিনের বাক্স খুললেন। ভেতরে মশলার হিসাব, কুসুমের স্কুলের সার্টিফিকেট, কয়েকটি ছবি এবং তাঁর বাবার লেখা চিঠি। একটি কাগজে লেখা ছিল, “শৈলবালার নাম নথির শেষে আছে। পাঁচ পাড়ার জলপথ কোনো এক পরিবারের নয়। কপি নিরাপদে রেখেছি।”

কাগজটির নিচের অংশ ছেঁড়া। তারিখ অস্পষ্ট। কুসুম বারবার “শৈলবালা” নামটি পড়ল।

“বাবা একসময় জমিদারবাড়ির নথি কপি করত,” চন্দনা বললেন। “মরার আগে বলেছিল, মোড়লবাড়ির পুরনো হিসাবের সঙ্গে আমাদের ঘরের কাগজও জড়িত। আমি গুরুত্ব দিইনি।”

“এটা আগে দেখাওনি কেন?”

“কাগজ ছিল, গল্প ছিল না। এখন গল্প কাগজ খুঁজছে।”

কুসুম কাগজটি আলোয় ধরল। তন্তুর মধ্যে পাঁচটি ফ্যাকাসে বিন্দু দেখা গেল। প্রথম চিঠির মতো।

বাইরে গোলাপী ডাকল। সে কীভাবে কলাবাগান পর্যন্ত এসেছে, কেউ জানে না। ডান পায়ের নীল ফিতা নতুন করে বাঁধা, কিন্তু তাতে আটকে থাকা পিতলের কণা নেই। কুসুম সেটি হরেনের কাছে রেখেছিল।

চন্দনা জানালার পাশে দাঁড়িয়ে বললেন, “শৈলবালা কে ছিল, সেটা খুঁজে বের কর। আর নিজের কলেজের ফর্মটাও লুকিয়ে রেখো না।”

কুসুম চমকে তাকাল।

চন্দনা মৃদু হাসলেন। “তোর ব্যাগ আমি ধুই না, কিন্তু ব্যাগের মুখ থেকে কাগজ বেরিয়ে থাকলে চোখ বন্ধ করি না।”

কুসুম প্রথমবার বুঝল, তদন্ত শুধু বাইরে নয়। ঘরের মানুষও তাকে দীর্ঘদিন ধরে পড়ছে।

* * *

মাটির নিচে কেবল বস্তু চাপা থাকে না, মানুষের নির্বাচিত স্মৃতিও থাকে।

৯. নন্দলাল

নন্দলাল সেন পঞ্চগ্রামে এলেন এমন একটি দুপুরে যখন বৃষ্টি আর রোদ নিজেদের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিতে পারছিল না। একবার ঝমঝম করে জল নামছে, পাঁচ মিনিট পরে মেঘের ফাঁক দিয়ে তীব্র আলো। বাজারপাড়ার বাসস্ট্যান্ডে তিনি নামতেই কাদা ছিটিয়ে বাস চলে গেল। হাতে জীর্ণ ক্যানভাসের ব্যাগ, কাঁধে পুরনো ক্যামেরা, গায়ে ধূসর পাঞ্জাবি। তাঁকে দেখে প্রথম যে কথা শোনা গেল, তা ভোলা দার।

“লোকটা গবেষক।”

গোপাল জিজ্ঞেস করল, “জানলে কী করে?”

“ব্যাগ দেখে। চোর হলে ব্যাগ নতুন হতো।”

নন্দলাল সুধীরের দোকানে এসে চা চাইলেন। তারপর বললেন, “এখানে কি পাঁচ কড়ির চিহ্ন পাওয়া গেছে?”

চায়ের দোকানের কথাবার্তা একসঙ্গে থেমে গেল। সুধীর কাপ নামিয়ে জিজ্ঞেস করল, “কে বলেছে?”

“জেলা নথিশালায় একটি খসড়া মানচিত্র আছে। তার পাশে পঞ্চগ্রামের নাম। কয়েক সপ্তাহ আগে কেউ আমাকে চিঠি লিখে জানিয়েছে, এখানে পুরনো কাগজ পাওয়া গেছে।”

“চিঠি?” হরেন সামনে এগোল। “কী লেখা?”

নন্দলাল ব্যাগ থেকে খাম বার করলেন। খামের ওপর ডাকঘরের সিল অস্পষ্ট। ভেতরের কাগজে মাত্র দুই লাইন:

“পাঁচ কড়ির পথ এখনও মাটির নিচে। বর্ষার শেষ পূর্ণিমার আগে পঞ্চগ্রামে আসুন।”

নিচে কোনো নাম নেই। কাগজ নতুন, কিন্তু বাক্যের ভঙ্গি প্রথম চিঠির মতো।

কুসুম চিঠিটি দেখল। হাতের লেখা আলাদা। প্রথম চিঠির সোজা বড় অক্ষর নয়, ছোট এবং বাঁকা। তবু “বর্ষার শেষ পূর্ণিমা” একই।

হরিহর খবর পেয়ে এলেন। নন্দলালের পরিচয় শুনে তাঁর গলা ঠান্ডা। “আপনি সরকারি লোক?”

“না।”

“অনুমতি আছে?”

“গ্রামের কাহিনি শুনতে অনুমতি লাগে না। খনন করতে লাগবে।”

“আপনি খনন করতে এসেছেন?”

“আমি নথি দেখতে এসেছি। কোথাও কিছু চাপা আছে কি না, তা নথিই বলবে।”

মহিম সর্দার দোকানের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল। সে বলল, “এ ধরনের লোক গুপ্তধনের কথা বলে গ্রামকে বিভ্রান্ত করে।”

নন্দলাল তাকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, “আপনি কি স্থানীয় জমির ব্যবসা করেন?”

মহিম বলল, “ধানের ব্যবসা।”

“নথিশালার মানচিত্রে পুরনো খালের পাশে আপনার আবেদনের নম্বর লেখা আছে।”

মহিমের মুখ শক্ত হলো। “সরকারি কাগজ সবার জন্য খোলা। আবেদন করলেই অপরাধ নয়।”

“আমি অপরাধ বলিনি।”

নন্দলালের মাপা কথায় মহিম আরও অস্বস্তি পেল। ভোলা দা কানে কানে বললেন, “গবেষকের কথা কম, কামড় বেশি।”

সেদিন সন্ধ্যায় নন্দলাল স্কুলের খালি ঘরে থাকার অনুমতি পেলেন। জগন্নাথ তাঁকে অতিথিশালার বদলে স্কুলে রাখতে চাইলেন, যাতে কাগজপত্রের ওপর নজর থাকে। নন্দলাল হাসলেন। “আপনি আমাকে সন্দেহ করছেন?”

“সন্দেহ মানে সিদ্ধান্ত নয়।”

“ভালো। আমিও সবাইকে সন্দেহ করছি।”

কুসুম তাঁর নোটবই দেখল। প্রতিটি পাতায় তারিখ, উৎসের নাম, শোনা কথা এবং পাশে প্রশ্নচিহ্ন। একটি পাতায় পাঁচ বিন্দুর চিহ্ন। নিচে লেখা, “১৮৯৭ সালের বন্যার পরে পাঁচ পাড়ার যৌথ ক্রয়, সূত্র অসম্পূর্ণ।”

“শৈলবালা নামটি জানেন?” কুসুম জিজ্ঞেস করল।

নন্দলাল পেন্সিল থামালেন। “কোথায় শুনলেন?”

“একটি পুরনো চিঠিতে।”

“চিঠি দেখতে পারি?”

“আপনি আগে বলুন।”

নন্দলাল জানালার বাইরে তাকালেন। বৃষ্টির জল স্কুলের মাঠে ছোট নালা বানিয়ে যাচ্ছে। “আমার মায়ের ঠাকুমার নাম ছিল শৈলবালা সেন নয়। শৈলবালা পাল। তিনি নাকি পঞ্চগ্রামে জন্মেছিলেন, পরে পরিবারসহ চলে যান। পরিবারের গল্পে বলা হতো, তিনি একবার পাঁচ পাড়ার জল বাঁচিয়েছিলেন। কিন্তু জেলা নথিতে তাঁর নাম শুধু একটি অসম্পূর্ণ অক্ষর হিসেবে আছে। আমি বহু বছর ধরে পুরো নথি খুঁজছি।”

কুসুম চন্দনার কাগজটি বার করল না। শুধু বলল, “আমাদের প্রথম চিঠির কাগজে পাঁচ বিন্দুর ছাপ আছে।”

নন্দলালের চোখে উত্তেজনা এল, কিন্তু তিনি কণ্ঠ নিয়ন্ত্রণে রাখলেন। “দেখতে হবে। আর চিহ্নটি কোথায় পাওয়া গেছে, সব জায়গা আলাদা করে দেখতে হবে।”

হরেন বলল, “আপনি গুপ্তধন খুঁজছেন না?”

“ইতিহাসের সঙ্গে সোনা থাকলে আপত্তি নেই। তবে সোনা থাকলে সাধারণত ইতিহাস হারায়।”

ভোলা দা, যিনি দরজার কাছে শুনছিলেন, বললেন, “আমাদের বটগাছের নিচে জমিদারের ধন আছে।”

নন্দলাল নোটবই খুললেন। “কোন জমিদার?”

ভোলা দা বললেন, “নামটা এখন মনে পড়ছে না।”

“কবে চাপা দিয়েছিলেন?”

“ব্রিটিশ আমলে।”

“ব্রিটিশ আমল দুইশো বছরের কাছাকাছি।”

“সেই জন্যই তো খুঁজে পাওয়া যায়নি।”

নন্দলাল লিখলেন, “ভোলানাথ ঘোষাল, অনির্দিষ্ট জমিদার, অনির্দিষ্ট সময়।” ভোলা দা কাগজের দিকে তাকিয়ে বললেন, “এভাবে লিখলে গল্পের মর্যাদা কমে।”

“পরে মর্যাদা যোগ করব। আগে তথ্য।”

নন্দলালের আগমন পঞ্চগ্রামে নতুন দুই গুজব তৈরি করল। একদল বলল তিনি শৈলবালার উত্তরাধিকারী, সব জমি নিতে এসেছেন। অন্যদল বলল তিনি সরকারের গোপন জরিপকারী। তৃতীয় একটি ক্ষুদ্র দল, যার নেতৃত্বে ভোলা দা, বলল তিনি গুপ্তধনের মানচিত্র পড়তে পারেন।

রাতে নন্দলালকে স্কুলে রেখে সবাই চলে গেলে তিনি ক্যামেরার ব্যাগ থেকে একটি পুরনো আলোকচিত্র বার করলেন। ছবিতে কাঁচা রাস্তার পাশে পাঁচজন নারী কোদাল হাতে দাঁড়িয়ে। পেছনে বটগাছ। ছবির ডানদিকের নারীটির মুখে কুসুমের সঙ্গে সামান্য মিল। ছবির পেছনে লেখা, “খাল খোলার দিন, শৈলবালা, ১৩০৪।”

নন্দলাল জানতেন না লেখাটি কার। তবে একই হাতের লেখা তিনি আগে আরেক জায়গায় দেখেছেন। হরিহর রায়ের পরিবারের একটি পুরনো হিসাবখাতার নকল পাতায়।

* * *

১০. ভুল মানচিত্র

পঞ্চগ্রামের পুরনো মানচিত্র কাগজে পাওয়া যাওয়ার আগে মানুষের মুখে পাওয়া গেল। সমস্যা হলো, প্রত্যেক মুখে মানচিত্রটি আলাদা।

নন্দলাল প্রস্তাব দিলেন, গ্রামের পাঁচজন প্রবীণকে আলাদা করে একই প্রশ্ন করা হবে। পুরনো খাল কোথা দিয়ে যেত, বটতলার জমি কার ছিল, এবং পাঁচ কড়ি বলতে কী বোঝাত। জগন্নাথ বললেন, "মৌখিক ইতিহাসে ভুল থাকবে।"

"ভুলও তথ্য," নন্দলাল উত্তর দিলেন। "মানুষ কী ভুলে গেছে, কী বদলেছে, সেটাও ইতিহাস।"

প্রথম সাক্ষাৎকার ভোলা দার। তিনি বটগাছ থেকে শুরু করে খালকে উত্তর দিকে নিয়ে গিয়ে মোড়লবাড়ির পুকুরে ঢোকালেন, তারপর বললেন, তাঁর দাদার সময়ে নৌকা সুধীরের দোকান পর্যন্ত আসত। সুধীর জানাল, তাঁর দোকান তখন ছিল না। ভোলা দা বললেন, "জায়গাটা তো ছিল।"

দ্বিতীয় সাক্ষাৎকার পঞ্চাননের। তিনি পঞ্জিকার পেছনে একটি রেখা এঁকে বললেন, খাল পশ্চিম থেকে দক্ষিণে যেত এবং পূর্ণিমার জোয়ারে উল্টো স্রোত উঠত। পাঁচ কড়ি ছিল পাঁচ পাড়ার প্রতীক। তিনি একটি ছড়া বললেন:

"পাঁচ কড়ি, পাঁচ হাত, জল খুলে বাঁচে মাঠ।"

জগন্নাথ বললেন, "ছড়াটি পরে তৈরি হতে পারে।"

পঞ্চানন উত্তর দিলেন, "আপনার স্কুলও পরে তৈরি। তাই বলে আজ নেই?"

তৃতীয় সাক্ষাৎকার বিনাপিসির। তিনি কাউকে ঘরে ঢুকতে দিলেন না। বারান্দায় বসে বললেন, "খাল কোথায় ছিল, তা বর্ষার জল জানে। মানুষ সীমানা টেনে ভুলে গেছে।"

নন্দলাল জিজ্ঞেস করলেন, "পাঁচ কড়ি?"

“পাঁচ পাড়া টাকা দিয়েছিল। জমি কিনে জল যাওয়ার পথ খোলা হয়েছিল।”

“কার কাছ থেকে কিনেছিল?”

বিনাপিসি একটু থামলেন। “রায়ের জমিদারির এক শাখা।”

“কাগজ দেখেছেন?”

“ছোটবেলায়।”

“কোথায়?”

“যেখানে কাগজ রাখা হয়।”

হরেন বিরক্ত হয়ে বলল, “পিসি, ঘুরিয়ে বলছ কেন?”

বিনাপিসি তার দিকে তাকালেন। “তুই সোজা কথা শুনে কতবার সোজা কাজ করেছিস?”

চতুর্থ সাক্ষাৎকার খালপাড়ার বদলে কলাবাগানের প্রবীণ জহুরা খাতুন। তিনি বললেন, তাঁর শাশুড়ি শুনেছিলেন এক বিধবা নারী খাল কাটার জন্য গয়না বিক্রি করেছিলেন। নাম শৈলবালা নয়, শেফালি। খালটি নাকি মোড়লদের জমি বাঁচাতে নয়, নিম্ন পাড়ার ঘর বাঁচাতে খোলা হয়েছিল।

পঞ্চম সাক্ষাৎকার গোপেশ্বর মণ্ডল। তিনি সব কথা অস্বীকার করলেন। “আমার জন্মের আগে যা হয়েছে, তা নিয়ে নিশ্চয়তা দেব না।”

নন্দলাল বললেন, “আপনি কী শুনেছেন?”

“শুনেছি অনেক। বিশ্বাস করিনি।”

“কোন কথাটি সবচেয়ে বেশি শুনেছেন?”

গোপেশ্বর একটু ভেবে বললেন, “মোড়লবাড়ির গুদামের নিচে কাগজ লুকানো ছিল। একবার আগুনে পুড়েছে। তবে আগুন কীভাবে লেগেছিল, কেউ বলে না।”

পাঁচ সাক্ষাৎকার শেষে পাঁচটি মানচিত্র তৈরি হলো। কোনো দুটি পুরো মেলে না। কিন্তু সব মানচিত্রে তিনটি জায়গা আছে: বটগাছ, দক্ষিণের জলমুখ এবং মোড়লবাড়ির পুরনো গুদাম। নন্দলাল স্বচ্ছ কাগজে পাঁচ রেখা একটির ওপর আরেকটি রাখলেন। যেখানে রেখাগুলো কাছাকাছি এসেছে, সেখানে একটি বাঁকা পথ বটগাছের পশ্চিম শিকড় থেকে পুরনো খালের দিকে গেছে।

হরেন বলল, “তা হলে খনন বটতলায়।”

জগন্নাথ বললেন, “মুখের কথার ওপর খনন করা যায় না।”

“পাঁচটি মুখে তিন জায়গা এক,” কুসুম বলল।

“সংঘবদ্ধ ভুলও হতে পারে।”

নন্দলাল বললেন, “আর একটি ভৌত সূত্র আছে। পিতলের পিনের কণা।”

হরেন শিশিটি এনে দিল। নন্দলাল লেন্সে দেখে বললেন, এটি সাধারণ পিন নয়, পুরনো নথির বন্ধনী। মাথার পাঁচ গর্তে মোম ঢেলে সিল করা হতো। কণাটির ধাতুতে মাটির ক্ষয় আছে। অর্থাৎ এটি দীর্ঘদিন মাটির ভেতরে ছিল।

“গোলাপীর ফিতায় এল কীভাবে?” কুসুম জিজ্ঞেস করল।

“ও যেখানে গিয়েছিল, সেখানে পিন বা তার অংশ আছে।”

ভোলা দা বললেন, “আমি বলেছিলাম হাঁসটি পথ দেখাচ্ছে।”

গোপাল বলল, “আপনি তখন বলেছিলেন হাঁসকে ভূত টানছে।”

“ভূতও পথ দেখাতে পারে।”

সন্ধ্যায় পাঁচ মানচিত্র হাটতলায় টাঙানো হলো। মানুষ নিজের পাড়ার রেখা দেখে হাসল, অন্য পাড়ার রেখাকে মিথ্যে বলল। পটলপাড়ার কৃষকেরা অভিযোগ করল, মোড়লপাড়ার মানচিত্রে তাদের ক্ষেত নেই। মোড়লপাড়ার লোকেরা বলল, কলাবাগানের মানুষ খালটিকে ইচ্ছে করে তাদের বাড়ির দিকে ঘুরিয়েছে। বাজারপাড়া দাবি করল,

পুরনো হাট তাদের জায়গায় ছিল। মোল্লাপাড়া বলল, সবাই তাদের বাঁশের সাঁকো ভুলে গেছে।

এই তর্কের মধ্যে মহিম সর্দার এসে মানচিত্র দেখে হেসে বলল, “শিশুর আঁকা রেখা দিয়ে জমির মালিকানা হয় না।”

কুসুম বলল, “কাগজের মানচিত্র আসার আগে মানুষ পথ মনে রাখত।”

“মনে রাখা আর দলিল এক নয়।”

নন্দলাল বললেন, “আপনার আবেদনপত্রে যে জরিপ নম্বর আছে, সেটি ১৯৬৮ সালের নকশার। তার আগের নথি দেখেছেন?”

মহিম বলল, “যা বৈধ, সেটাই দেখেছি।”

“বৈধ কাগজ কীভাবে তৈরি হয়েছে, সেটিও দেখা হবে।”

মহিম চলে গেল। তার পেছনে মাখনও। দুজন একসঙ্গে কথা বলেনি, কিন্তু একই সময়ে ওঠা কুসুমের চোখ এড়াল না।

রাতে হরেন গোপনে বটগাছের কাছে গেল। সে খনন করতে নয়, ফোনের টর্চে মাটি দেখতে গেছে বলে পরে দাবি করে। পশ্চিম শিকড়ের কাছে মাটি অন্য জায়গার চেয়ে শুকনো। বৃষ্টির পরে এমন হওয়া অস্বাভাবিক। সে লাঠি ঢুকিয়ে দেখল, নিচে ফাঁপা শব্দ।

পেছন থেকে ভোলা দার গলা এল, “একা গুপ্তধন পেলে ভাগ দেবে?”

হরেন ঘুরে দেখল, ভোলা দার সঙ্গে গোপালও। গোপালের হাতে কোদাল।

“আমি কোদাল আনিনি,” গোপাল বলল। “ভোলা দা বলেছে, জমিতে কেঁচো দেখবে।”

ভোলা দা বললেন, “কেঁচোরও ইতিহাস আছে।”

হরেন বুঝল, রাতটি শুধু দেখা দিয়ে শেষ হবে না।

* * *

১১. বটতলার রাত

বটগাছের নিচে রাতের খনন শুরু হলো তিনজনের মধ্যে কে সবচেয়ে কম দোষী, সেই বিতর্ক দিয়ে। হরেন বলল, সে শুধু মাটি পরীক্ষা করছিল। গোপাল বলল, কোদাল সে এনেছে, কিন্তু উদ্দেশ্য কেঁচো। ভোলা দা বললেন, তিনি দুজনকে বিপদ থেকে রক্ষা করতে এসেছেন।

"তা হলে কোদালের দ্বিতীয়টা কার?" হরেন জিজ্ঞেস করল।

ভোলা দা গামছার নিচে রাখা ছোট কোদালের দিকে তাকালেন। "রক্ষার উপকরণ।"

বটগাছের ডাল এত ঘন যে চাঁদের আলো মাটিতে পৌঁছায় না। দূরে সুধীরের দোকানের টিন মৃদু চকচক করছে। খাল থেকে ভেজা গন্ধ। তিনজন পশ্চিম শিকড়ের শুকনো জায়গায় মাটি সরাতে শুরু করল।

প্রথম দশ মিনিটে কেবল পাথর, কেঁচো এবং গোপালের হাঁপানি। পনেরো মিনিটে কোদাল শক্ত কিছুর গায়ে লাগল। ধাতব নয়, পাকা ইট। ইটগুলো বাঁকা রেখায় বসানো। হরেন টর্চ ফেলতেই দেখা গেল, ইটের ফাঁকে কালো মোমের দাগ।

ভোলা দা ফিসফিস করে বললেন, "সিল করা পথ।"

গোপাল বলল, "ইটের নালা।"

"গুপ্ত নালা।"

"নালার কাজ জল নেওয়া। গুপ্ত কাজ করলে পচে যাবে।"

তারা আরও মাটি সরাল। একটি পিতলের পিনের মাথা বেরোল। পাঁচটি গর্ত। হরেন শিশির কণার সঙ্গে মিলিয়ে দেখল। ঠিক একই।

তখনই বটগাছের মাথা থেকে "হু" করে দীর্ঘ শব্দ এল। তিনজন থামল। বাতাস ছিল, কিন্তু শব্দটি বাতাসের চেয়ে ভারী। তারপর শুকনো পাতার মধ্যে পায়ের শব্দ।

হরেন টর্চ ঘোরাল। আলোয় সাদা কিছু নড়ল। গোপাল কোদাল তুলে ধরল। ভোলা দা বললেন, “আমি আগেই বলেছিলাম রাতটা শুভ নয়।”

সাদা বস্তুটি গোলাপী। সে কোথা থেকে এসে শিকড়ের ওপর দাঁড়িয়ে মাথা কাত করেছে। হরেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতেই অন্য দিক থেকে ধাতব ঠং। তারপর গাছের কাণ্ডে লাল আলো জ্বলে উঠল।

ভোলা দা কোদাল ফেলে দৌড় দিলেন। দুই পা গিয়ে গামছায় পা জড়িয়ে পড়ে গেলেন। গোপাল তাঁকে তুলতে গিয়ে নিজেই বসে পড়ল। হরেন বুঝল, আলোটি মাটির কাছ থেকে আসছে। সে এগিয়ে একটি ছোট লণ্ঠন পেল, কালো কাপড়ে ঢাকা। সুতো টানলে কাপড় সরে আলো বেরোয়।

“কেউ ভয় দেখানোর ব্যবস্থা করেছে,” সে বলল।

ঝোপের ভেতর শব্দ হলো। হরেন দৌড়ে গেল। একটি ছায়া খালের দিকে পালাল। ডান পায়ের চটির ছাপে অর্ধচন্দ্রের ফাঁক। একই দাগ গোলাপীর খোঁয়াড়ে ছিল।

সে ছায়াকে ধরতে পারল না। ফিরে এসে দেখল, ভোলা দা আবার সাহস ফিরে পেয়েছেন। “আমি ইচ্ছা করেই পড়ে গিয়েছিলাম। নিচ থেকে আক্রমণ এলে বুঝতে সুবিধা।”

গোপাল বলল, “আপনি নিচে গিয়ে চোখ বন্ধ করেছিলেন।”

“শব্দ শুনছিলাম।”

তারা ঠিক করল, আর খুঁড়বে না। কিন্তু তখন মাটির নিচ থেকে ক্ষীণ জলধ্বনি এল। ইটের নালার কোনো অংশে পানি চলছে। হরেন কান লাগিয়ে শুনল। শব্দ পশ্চিম থেকে দক্ষিণে। পুরনো খাল পুরো মৃত নয়।

ঠিক সেই সময় জগন্নাথের কণ্ঠ শোনা গেল। “আর একবার কোদাল চালালে থানায় খবর দেব।”

কুসুম, নন্দলাল, জগন্নাথ ও পঞ্চানন লণ্ঠন নিয়ে হাজির। কুসুমের মুখে রাগ, উদ্বেগ এবং সামান্য স্বস্তি।

"তুমি ফোন ধরছিলে না," সে হরেনকে বলল।

"মাটি খুঁড়লে ফোনের শব্দ শুনিনি।"

"তুমি বলেছিলে দেখতে যাচ্ছ।"

"দেখতে গিয়ে নিচে জিনিস দেখেছি।"

জগন্নাথ কঠিন গলায় বললেন, "পুরনো স্থাপনা ভেঙে ফেলতে পারতে। প্রমাণ নষ্ট হতে পারত।"

হরেন মাথা নিচু করল। ভোলা দা বললেন, "তরুণরা কখনো কখনো আবেগে কাজ করে।"

কুসুম তাঁর দিকে তাকাল। "দ্বিতীয় কোদালটি আবেগে নিজে এসেছিল?"

নন্দলাল গর্ত পরীক্ষা করলেন। ইটের রেখা দেখে বললেন, এটি পুরনো জলনালার প্রান্ত। পিতলের পিন এখানে থাকার অর্থ, কোনো নথি বা বাক্স কাছেই সিল করা হয়েছিল। তবে রাতের অন্ধকারে আর খোঁড়া যাবে না। সকালে গ্রামের সামনে, জায়গা চিহ্নিত করে কাজ হবে।

পঞ্চানন লাল আলোয় ব্যবহৃত সুতো তুলে দেখলেন। "মাখনের পুঁটলির সুতো।"

জগন্নাথ বললেন, "সুতো বাজারেও পাওয়া যায়।"

"হ্যাঁ," পঞ্চানন বললেন। "কিন্তু গিঁট তার লোকেরা একইভাবে বাঁধে। তিন পাক, এক উল্টো পাক।"

কুসুম অবাক হয়ে দেখল। পঞ্চানন এমন সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ করেছেন, যা সে করেনি। সে মনে মনে নিজের সেই অভ্যাসটি ধরল, শিক্ষিত যুক্তিকে সহজে প্রমাণ এবং প্রথানির্ভর মানুষের কথাকে সহজে অনুমান ভাবা।

ফেরার আগে নন্দলাল বটগাছের কাণ্ডে হাত রেখে বললেন, “এই জায়গায় কাল কেউ আগেই আসবে।”

হরিহরকে খবর দিলে তিনি খনন বন্ধ রাখতে পাহারা বসানোর নির্দেশ দিলেন। পাহারায় দাসু ও মাধব। কিন্তু ভোরের দিকে দুজনেই ঘুমিয়ে পড়ে। যখন সূর্য ওঠে, গর্তের পাশে নতুন করে একটি ছোট চিহ্ন আঁকা দেখা যায়। পাঁচটি বিন্দুর নিচে একটি নারীর নামের প্রথম অক্ষর: “শৈ”।

কেউ দেখেনি, কে লিখেছে। চিহ্নটি নীল কাদায় আঁকা, আর তার পাশে গোলাপীর পায়ের ছাপ।

* * *

১২. লোহার বাক্স

সকাল থেকে বটতলায় এমন ভিড় হলো, যেন খননের বদলে মেলা বসেছে। হরিহর বাঁশের দড়ি দিয়ে জায়গা ঘিরে দিলেন। সুধীর চায়ের অস্থায়ী চুলা বসাল। মদন হারমোনিয়াম আনেনি, কিন্তু একটি ঢোল নিয়ে এসেছে, কারণ বাক্স উঠলে শব্দ করা দরকার বলে তার ধারণা। জগন্নাথ ঢোল সরিয়ে রাখতে বললেন। মদন বলল, “ইতিহাস নীরবে ওঠে?”

নন্দলাল প্রথমে জায়গার ছবি তুললেন, মাপ নিলেন এবং উপস্থিত কয়েকজনের নাম লিখলেন। হরিহর বিরক্ত হয়ে বললেন, “এত লেখালেখি করলে দুপুর হয়ে যাবে।”

“বাক্স পাওয়া যত গুরুত্বপূর্ণ, কীভাবে পাওয়া হলো তার নথিও তত গুরুত্বপূর্ণ।”

“গ্রামের সবাই সাক্ষী।”

“গ্রামের সবাই পরে একই কথা বলবে না।”

ভোলা দা প্রতিবাদ করলেন, “আমরা মূল বিষয়ে এক থাকি।”

সুধীর বলল, “আপনি রাতের ঘটনার তিনটি সংস্করণ ইতিমধ্যে বলেছেন।”

দড়ির ভেতরে কাজ করল হরেন, গোপাল, নন্দলাল এবং দুজন কৃষক। কুসুম পাশে নোট নিল। জগন্নাথ মাটি সরানোর ক্রম দেখলেন। পশ্চিম শিকড়ের নিচে ইটের নালার পাশে প্রায় দুই হাত গভীরে কোদাল লোহার গায়ে লাগল।

এইবার কেউ “পেয়েছি” বলে চিৎকার করল না। রাতের অভিজ্ঞতার পরে সকলেই একটু সতর্ক। মাটি ধীরে সরানো হলো। একটি ছোট লোহার বাক্স বেরোল, মরচে ধরা, চারদিকে মোম ও কাপড়ের চিহ্ন। তালা নেই, কিন্তু ঢাকনা জংয়ে আটকে।

হরিহর বললেন, “মোড়লবাড়িতে নিয়ে খুলতে হবে।”

কলাবাগানের লোকেরা সঙ্গে সঙ্গে আপত্তি করল। “বটতলার জিনিস বটতলায় খুলবে।”

মহিম বলল, “আইন অনুযায়ী সরকারি কর্তৃপক্ষকে জানানো উচিত।”

নন্দলাল বললেন, “ঠিক। তবে বাক্স না খুলে ভেতরের অবস্থা জানা যাবে না। উপস্থিত সবাইকে সাক্ষী রেখে নথি করা হবে, তারপর প্রয়োজন হলে ব্লক অফিসে জানাব।”

কুসুম বলল, “কেউ একা হাতে নেবে না।”

হরিহর তার দিকে তাকালেন, কিন্তু বিরোধ করলেন না।

গোপাল পাতলা ছেনি দিয়ে জং ছাড়াল। ঢাকনা উঠতেই ভেতর থেকে ভেজা লোহা, কর্পূর এবং পুরনো কাপড়ের গন্ধ বেরোল। প্রথম চিঠির কাগজে একই গন্ধ ছিল।

বাক্সে সোনা ছিল না। ছিল কয়েকটি তামার থালা, পাঁচটি আলাদা আকারের পুরনো কড়ি, মাটিতে কালো হয়ে যাওয়া তিনটি মুদ্রা, একটি ছোট পিতলের ঘণ্টা, কাপড়ে মোড়া কাগজ এবং কাঠের খাপে একটি মানচিত্র।

মদন হতাশ হয়ে বলল, “একটাও সোনার মোহর নেই?”

গোপাল বলল, “তামার থালা হলেও রান্না করা যায়।”

নন্দলাল কঠিন গলায় বললেন, “কিছু স্পর্শ করবেন না।”

ভোলা দা ফিসফিস করলেন, “গবেষকরা জিনিসের ব্যবহার বোঝে না।”

কাগজটি অত্যন্ত ভঙ্গুর। নন্দলাল তুলোর কাপড়ের ওপর খুললেন। ওপরের অংশে পুরনো বাংলা ও ইংরেজি নথির মিশ্র লেখা। নিচে কয়েকটি নাম। প্রথম দুটি স্পষ্ট নয়। তৃতীয় লাইনে “শৈল...” পড়া যায়, পরের অংশ ঘষে মুছে গেছে। আরেক পাশে পাঁচটি পাড়ার নামের পুরনো রূপ। নথির মাঝখানে একটি পৃষ্ঠা ছেঁড়া। সেলাইয়ের সুতো ঝুলে আছে।

মানচিত্রে বটগাছ থেকে দক্ষিণ পশ্চিমে নীল রেখা, পুরনো খাল। পাঁচ জায়গায় পাঁচ কড়ির চিহ্ন। মোড়লবাড়ির গুদাম, স্কুলের আগের মাঠ এবং বর্তমান হাটতলার জায়গা চিহ্নিত। এক কোণে লেখা, "সাধারণের পথ, কোনো ব্যক্তি বন্ধ করিবে না।"

কুসুম বাক্যটি পড়ল। ভিড় নিঃশব্দ।

হরিহর বললেন, "কাগজ কত পুরনো, সত্যি কি না, পরীক্ষা না করে সিদ্ধান্ত হবে না।"

"ঠিক," জগন্নাথ বললেন। "কিন্তু এটাকে অগ্রাহ্যও করা যাবে না।"

নন্দলাল পাঁচটি কড়ি আলাদা করে দেখলেন। প্রতিটির এক পাশে ভিন্ন চিহ্ন। একটি ধানের শিষ, একটি তাঁতের মাকু, একটি কলস, একটি মাছ, একটি বটপাতা। পাঁচ পাড়ার পেশা ও পরিচয়ের পুরনো প্রতীক হতে পারে।

পঞ্চানন ছোট পিতলের ঘণ্টাটি দেখে ফ্যাকাসে হলেন। "এই শব্দটাই কি হরেনের রেকর্ডে ছিল?"

হরেন ফোনে রেকর্ড চালাল। শেষের একবারের ধাতব ধ্বনি ও ঘণ্টার স্বর কাছাকাছি। কিন্তু বাক্স তখন মাটির নিচে। বাতাসে বাজা সম্ভব নয়।

জগন্নাথ বললেন, "অন্য কোনো ঘণ্টা।"

পঞ্চানন উত্তর দিলেন না।

বাক্সের তলায় একটি ভাঁজ করা আধুনিক কাগজ পাওয়া গেল। কালি বেশি পুরনো নয়। তাতে লেখা: "পৃষ্ঠা ছাড়া হিসাব অসম্পূর্ণ। যে নাম মুছে গেছে, তার সাক্ষ্য ফিরিয়ে আনুন।"

হাতের লেখা নন্দলালের পাওয়া চিঠির মতো। নন্দলাল নিজেই চমকে গেলেন। "এটা আমি লিখিনি।"

হরিহর তীক্ষ্ণভাবে বললেন, "আপনার চিঠি আর এই লেখা একই হলে আপনাকেই আগে উত্তর দিতে হবে।"

নন্দলাল কাগজ দুটি পাশাপাশি রাখলেন। অক্ষর মিল আছে, কিন্তু সম্পূর্ণ নয়। কেউ একই ধরনের হাতের লেখা নকল করতে পারে। তিনি বললেন, “আমাকে সন্দেহ করুন। তবে কাগজটি বাক্সে কবে ঢুকেছে, সেটাও দেখুন। বাক্সের ঢাকনা পুরো সিল ছিল না। পাশের মরচে ভাঙা অংশ দিয়ে পাতলা কাগজ ঢোকানো সম্ভব।”

কুসুম বাক্সের ডান পাশে ছোট ফাঁক দেখল। সেখানে নতুন মোমের আঁচড়। কেউ সাম্প্রতিক সময়ে বাক্সের জায়গা জানত এবং বার্তা ঢুকিয়েছে। কিন্তু বাক্স তুলল না কেন? হয়তো একা তুলতে পারেনি, অথবা চেয়েছে গ্রামবাসীর সামনে উঠুক।

ভিড়ের পেছনে মহিম আর মাখন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছিল। আধুনিক কাগজ বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে মাখন সরে গেল। মহিম কিছুক্ষণ পরে।

নন্দলাল নথিটি কাপড়ে ঢেকে বললেন, “আজ থেকে এই বাক্স কোনো ব্যক্তির ঘরে থাকবে না। স্কুলের তালাবদ্ধ আলমারিতে, দুইটি আলাদা চাবিতে। একটি জগন্নাথবাবুর কাছে, একটি কুসুমের কাছে। খোলার সময় অন্তত তিনজন থাকবে।”

হরিহর বললেন, “মোড়ল হিসেবে আমার চাবি?”

কুসুম শান্তভাবে বলল, “আপনি সাক্ষী ও সম্ভাব্য সংশ্লিষ্ট পরিবারের প্রতিনিধি। পরে সিদ্ধান্ত বদলানো যাবে। আপাতত দূরত্ব ভালো।”

হরিহর জনতার সামনে আপত্তি করলেন না। তাঁর নীরবতা সম্মতি কি না, কেউ বুঝল না।

বাক্স স্কুলে নিয়ে যাওয়া হলো। মদন ঢোল বাজায়নি। বরং পঞ্চাননের মুখে পুরনো ছড়ার সুর উঠল। পাঁচ কড়ি, পাঁচ হাত, জল খুলে বাঁচে মাঠ। কয়েকজন প্রবীণ ধীরে ধীরে সুর ধরল।

কুসুম কাগজে মুছে যাওয়া নামটির দিকে শেষবার তাকাল। “শৈল” অংশের পরে খুব ক্ষীণ একটি বাঁক আছে। হয়তো “ব”, হয়তো “ম”। ইতিহাসের একটি নাম এত কাছে, তবু পুরো দেখা যাচ্ছে না।

বটগাছের ডালে গোলাপী বসতে পারে না। তবু সবাই ওপরে তাকিয়ে দেখল, একটি সাদা পালক বাতাসে ঘুরতে ঘুরতে বাক্সের ফাঁকা গর্তে পড়ল।

* * *

নথি যা বলে, নীরবতা কখনো কখনো তার চেয়েও বেশি বলে।

১৩. পাঁচ কড়ির চিহ্ন

লোহার বাক্স ওঠার পরে পঞ্চগ্রামে দুই ধরনের মানুষ দেখা গেল। একদল প্রতিদিন স্কুলে এসে জানতে চাইত, কাগজে কত সোনা লেখা আছে। অন্যদল বলত, কাগজ যত পুরনো, বিপদ তত বেশি। তৃতীয় একটি দলও ছিল, যারা দাবি করত তারা কোনো দলেই নেই, কিন্তু প্রতিদিন হাটতলায় একই আলোচনা করত।

নন্দলাল নথি শুকোনোর জন্য স্কুলের এক ঘরে কাচের ওপর কাপড় বিছিয়ে কাজ শুরু করলেন। জানালা খোলা রাখা যায় না, বর্ষার আর্দ্রতা। পুরো বন্ধও রাখা যায় না, কাগজে ছত্রাক। জগন্নাথ ছাত্রদের বিজ্ঞান কোণের ভাঙা পাখা মেরামত করে দিলেন। হরেন তার মোবাইল মেরামতের সরঞ্জাম থেকে ছোট স্ক্রু ড্রাইভার এনে পাখার সুইচ ঠিক করল।

“প্রযুক্তির প্রতি শ্রদ্ধা বাড়ছে?” সে কুসুমকে জিজ্ঞেস করল।

কুসুম বলল, “যে প্রযুক্তি কাজ করে, তার প্রতি।”

নন্দলাল পাঁচটি কড়ি পরিষ্কার করলেন না। শুধু শুকনো তুলো দিয়ে মাটি সরালেন। প্রতিটি কড়ির ওজন, মাপ ও চিহ্ন লিখলেন। ধানের শিষ পটলপাড়ার কৃষিজীবন, মাকু মোল্লাপাড়ার তাঁতি ও কারিগর, কলস কলাবাগানের কুমোর পরিবার, মাছ পুরনো খালপাড়ার জীবিকা, বটপাতা হাটতলার সাধারণ জমির প্রতীক। বাজারপাড়া পরে গড়ে ওঠায় পুরনো পাঁচ পাড়ার নাম বর্তমান নামের সঙ্গে পুরো মেলে না।

“তা হলে পঞ্চগ্রাম আগে অন্য পাঁচ পাড়া ছিল?” হরেন জিজ্ঞেস করল।

“পাড়া বদলায়, নাম বদলায়, মানুষ সরে যায়,” নন্দলাল বললেন। “কিন্তু চিহ্নের ভিতরে পুরনো সম্পর্ক থেকে যায়।”

নথির প্রথম অংশ পড়া গেল। ১৩০৪ বঙ্গাব্দের ভয়াবহ বন্যার পরে পাঁচ পাড়ার পরিবারগুলি কড়ি, শ্রম, ধান এবং গয়না দিয়ে জলনিকাশির জমি কিনেছিল। জমিটি

কারও ব্যক্তিগত উত্তরাধিকার হবে না। বটতলা, দক্ষিণের জলমুখ, হাটের মাঠ এবং দুটি পুকুর যৌথ ব্যবহারের জন্য থাকবে।

জগন্নাথ বললেন, “এটি অছি দলিল ধরনের নথি।”

পঞ্চানন বললেন, “আমাদের ভাষায় বললে, সবার সম্পত্তি।”

“সবার মানে কারও নয়, এমন ভাবলে বিপদ।”

“কারও মানে একজনের, এমন ভাবলেও বিপদ।”

দুজনের তর্ক এখন আগের চেয়ে কম ধারালো। বাক্সের ঘটনার পরে জগন্নাথ বুঝেছেন, পঞ্চাননের লোককথায় তথ্য আছে। পঞ্চাননও মেনে নিয়েছেন, ছড়া দিয়ে আদালতে জমি রক্ষা কঠিন।

নন্দলাল জেলা নথিশালার নকল মানচিত্র খুললেন। তাতে পাঁচ কড়ির চিহ্ন আছে, কিন্তু যৌথ জমি সম্পর্কিত কয়েকটি লাইন অনুপস্থিত। ১৯৬৮ সালের জরিপে বটতলা সাধারণ জমি, কিন্তু দক্ষিণের জলমুখ মোড়ল পরিবারের খতিয়ানে ঢুকে গেছে। ১৯৮৬ সালের নথিতে সেখানে ব্যক্তিগত বাগান। বর্তমান আবেদনে মহিম সেটি গুদামের জন্য ইজারা নিতে চাইছে।

কুসুম জিজ্ঞেস করল, “পরিবর্তনটা ভুলে, না ইচ্ছে করে?”

নন্দলাল বললেন, “এখনই বলা যাবে না। পুরনো নামজারি নথি দেখতে হবে। তবে নথি বদল একদিনে হয় না। কেউ আবেদন করে, কেউ সাক্ষ্য দেয়, কেউ আপত্তি করে না।”

হরিহর সেই সময় দরজায় দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি বললেন, “আমাদের পরিবার বহু বছর জায়গা দেখাশোনা করেছে। খাল বন্ধ হয়ে গেলে জমি পতিত ছিল। খতিয়ানে নাম উঠলে অপরাধ নয়।”

কুসুম বলল, “সাধারণের জমি দেখাশোনা আর নিজের নামে নেওয়া এক নয়।”

হরিহর গলা উঁচু করলেন। “তুমি কি আমাকে চোর বলছ?”

“আমি প্রশ্ন করছি।”

“প্রশ্নের ভঙ্গিতেও অভিযোগ থাকে।”

জগন্নাথ বললেন, “আমরা কারও চরিত্রের বিচার করছি না। নথির পরিবর্তন দেখছি।”

“নথি কাগজ। গ্রামের কাজ মানুষ করেছে। খাল বহু বছর কেউ পরিষ্কার করেনি। মোড়লবাড়ি টাকা দিয়েছে।”

কলাবাগানের জহুরা খাতুন, যিনি বাইরে শুনছিলেন, ভেতরে এসে বললেন, “আমাদের লোক কাদা কেটেছে। টাকা কাদের নামে গেছে, জানি না।”

হরিহর তাঁর দিকে তাকালেন। জহুরা চোখ নামালেন না।

নথির নিচের অংশে কয়েকজন সাক্ষীর নাম। একটি পুরুষের নামের পাশে “মোড়ল প্রতিনিধি”, আরেকজন “মণ্ডল প্রতিনিধি”। মুছে যাওয়া নামটির আগে স্পষ্ট লেখা “শ্রীমতী”। অর্থাৎ শৈলবালা শুধু শ্রমিক নন, নথির সাক্ষী বা দাতা।

পঞ্চানন তাঁর পুরনো ছড়ার আরও লাইন মনে করলেন:

“শৈল মায়ের কাঁকন গেল, খালের মুখে আলো জ্বেল।”

জগন্নাথ বললেন, “মা শব্দটি সম্মানার্থে হতে পারে।”

নন্দলাল লিখলেন। “কাঁকন বিক্রির মৌখিক স্মৃতি। নথিতে গয়নার অবদান আছে। মিলে যাচ্ছে।”

কুসুম মনে মনে চন্দনার কাগজের কথা ভাবল। “শৈলবালার নাম নথির শেষে আছে।” তার বাবার লেখা। তা হলে তাঁর কাছে নথির কোনো কপি ছিল।

বিকেলে পাঁচ কড়ি নিয়ে হাটতলায় আলোচনা হলো। মাখন বলল, চিহ্নটি আসলে পাঁচ শক্তির সিল। নন্দলাল ঠান্ডা গলায় জিজ্ঞেস করলেন, “কোন পাঁচ শক্তি?”

মাখন বলল, “সব নাম প্রকাশ করা যায় না।”

সুধীর চা দিতে দিতে বলল, “শিবুর রাসায়নিকের মতো?”

শিবু, যে দোকানের কোণে চুপচাপ বসেছিল, মাথা তুলল না।

মহিম সর্দার ঘোষণা করল, পুরনো নথি সত্যি হলেও বর্তমান আইনে জমির ব্যবহার বদলানো যায়। গুদাম হলে কর্মসংস্থান হবে। কলাবাগানের মানুষ জিজ্ঞেস করল, বন্যা হলে গুদামের দেওয়াল তাদের জল আটকাবে কি না। মহিম বলল, আধুনিক নিকাশি থাকবে। কেউ নকশা দেখতে চাইলে সে বলল, অনুমোদনের পরে দেখাবে।

কুসুম বলল, “জল আগে আসবে, না অনুমোদন?”

মহিম এবার রেগে গেল। “তুমি প্রতিটি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নও।”

“তাই প্রশ্ন করছি।”

ভিড়ের মধ্যে কেউ হেসে উঠল না। কথাটি কৌতুক নয়, সংঘাত।

সেদিন রাতে কুসুম কলেজের ফর্ম বার করল। শেষ তারিখ আরও বারো দিন। ভর্তি হলে সপ্তাহে তিন দিন শহরে যেতে হবে। মায়ের ওষুধ, টিউশন, নথির কাজ, সব কীভাবে চলবে জানে না। সে ফর্ম ভাঁজ করে আবার রাখছিল, চন্দনা এসে বললেন, “ইতিহাস বাঁচাতে গিয়ে নিজের ভবিষ্যৎ চাপা দিস না।”

“সব একসঙ্গে পারব?”

“সব একা পারবি না। সেটাই শেখ।”

কুসুম জানালার বাইরে দেখল। বৃষ্টির জলে উঠোনের নালা ভরে গেছে। ছোট জলও পথ না পেলে দাঁড়িয়ে থাকে। মানুষের জীবনও কি তেমন, সে ভাবল।

* * *

নথির ছেঁড়া সেলাই পরীক্ষা করে নন্দলাল বললেন, হারানো পৃষ্ঠা বহু বছর আগে তোলা হয়েছে। কাগজের ধারে পুরনো ধুলো, নতুন ছেঁড়ার সাদা তন্তু নেই। তবে বাক্সে আধুনিক বার্তা ঢোকানো হয়েছে সাম্প্রতিক সময়ে। অর্থাৎ দুই সময়ের দুই রহস্য।

হরিহর চাইলেন বিষয়টি পুলিশে যাক। তাঁর যুক্তি, বাক্সে কাগজ ঢোকানো মানে প্রমাণে হস্তক্ষেপ। কুসুম সন্দেহ করল, পুলিশ এলে নথি নিয়ে যাবে এবং গ্রামের হাত থেকে নিয়ন্ত্রণ সরে যাবে। নন্দলাল বললেন, সরকারি সংরক্ষণ দরকার হলেও আগে প্রতিটি পাতার ছবি, তালিকা ও সাক্ষ্য তৈরি হোক।

এই সময় পঞ্চাননের বাড়ি থেকে একটি খবর এল। তাঁর কাঠের বাক্সে পুরনো নথির মতো কাগজ আছে। খবরটি ছড়িয়েছে মাখনের সহকারী কানাই। সে নাকি পূজার দিন পঞ্চাননকে হলদেটে কাগজ লুকাতে দেখেছে।

কুসুমের মনে আগের সন্দেহ ফিরে এল। পঞ্চানন “শৈল” নামের ছড়া জানেন, পাঁচ কড়ির চিহ্ন চিনেছেন, পিতলের পিনের গিঁট বুঝেছেন। তিনি হয়তো নথির পৃষ্ঠা পেয়েছিলেন এবং নিজের প্রভাব রক্ষায় লুকিয়েছেন।

জগন্নাথ বললেন, “প্রথমে তাঁকে জিজ্ঞেস করা উচিত।”

কুসুম বলল, “জিজ্ঞেস করলে সরিয়ে ফেলতে পারেন।”

“তুমি প্রমাণ ছাড়া তাঁকে দোষী ধরে নিচ্ছ।”

“তাঁর কাছে তথ্য ছিল, বলেননি।”

“তথ্য আর পৃষ্ঠা এক নয়।”

কুসুম শুনল না। হরেনকে নিয়ে বিকেলে পঞ্চাননের বাড়িতে গেল। পঞ্চানন বারান্দায় বসে পঞ্জিকা মেরামত করছিলেন। কুসুম সরাসরি বলল, “আপনার কাঠের বাক্স দেখতে হবে।”

পঞ্চানন চশমার ওপর দিয়ে তাকালেন। “কেন?”

“হারানো পৃষ্ঠার বিষয়ে।”

“তুমি মনে করো আমার কাছে আছে?”

“আমি দেখতে চাই।”

“প্রথমে উত্তর দাও।”

কুসুম চুপ করে রইল। হরেন অস্বস্তিতে পায়ের আঙুল দিয়ে মাটি খুঁটল।

পঞ্চানন ধীরে বাক্সের চাবি দিলেন। “দেখো। তবে মনে রেখো, সন্দেহ করা সহজ। সন্দেহের ভাষা ফেরত নেওয়া কঠিন।”

বাক্সে ছিল পঞ্জিকা, বিয়ের আমন্ত্রণপত্র, মৃত মানুষের নামের তালিকা, পুরনো গান, কয়েকটি হাতের লেখা ছড়া এবং একটি হলদেটে কাগজ। কাগজটি নথির পৃষ্ঠা নয়। শৈলবালাকে নিয়ে স্মরণগীতের কপি। নিচে পঞ্চাননের বাবার লেখা: “মূল কাগজ রায়বাড়ির গুদামে ছিল। আগুনের পরে কপি চন্দ্রেশ সামন্তের কাছে।” চন্দ্রেশ ছিলেন চন্দনার বাবা।

কুসুমের মুখ গরম হয়ে উঠল। পঞ্চানন বললেন, “আমি এই কাগজ দেখেই পাঁচ কড়ি চিনেছি। প্রথম দিনে সব বলিনি, কারণ পুরোটা মনে ছিল না। পরে খুঁজে পেয়েছি। আজ তোমাদের ডাকার কথা ছিল।”

“কানাই বলেছে আপনি লুকাচ্ছিলেন।”

“মাখনের লোক আমার ঘরের জানালা দিয়ে যা দেখে, তার অর্ধেক সত্য। বাকি অর্ধেক তার মজুরি।”

কুসুম ক্ষমা চাইতে চাইল, কিন্তু প্রথম বাক্য বেরোল না। জগন্নাথের কথা মনে পড়ল। প্রমাণের আগে সন্দেহকে অভিযোগ করা ভোলার কাজ। সে নিজেই সেই ভুল করেছে।

“আমি আপনাকে দোষী ধরে নিয়েছিলাম,” সে বলল। “ভুল করেছি।”

পঞ্চানন কিছুক্ষণ চুপ থাকলেন। "ভুল স্বীকার করা ভালো। কিন্তু পরেরবার এমন কারও ঘরে ঢুকবে, যে তোমাকে চাবি দেবে না। তখন কী করবে?"

"প্রমাণ জোগাড় করব।"

"আর মানুষের সম্মান?"

"সেটাও প্রমাণের অংশ।"

পঞ্চাননের মুখ নরম হলো। তিনি কাগজটি কুসুমকে দিলেন, তবে নকল করার শর্তে। মূল তাঁর কাছেই থাকবে।

চন্দ্রেশ সামন্তের নাম সামনে আসায় কুসুম চন্দনার টিনের বাক্স আবার দেখল। সেখানে ছেঁড়া চিঠি ছাড়া আর কিছু নেই। চন্দনা বললেন, বাবার মৃত্যুর পরে একটি বড় কাগজের খাম হারিয়েছিল। বাড়ি মেরামতের সময় অনেক কাগজ বাজারে পুরনো কাগজ হিসেবে বিক্রি হয়েছে। সুধীরের দোকানের গাদা সেই সময়ের হতে পারে।

"কে বিক্রি করেছিল?" কুসুম জিজ্ঞেস করল।

"আমি। তখন ওষুধের টাকা দরকার ছিল।"

চন্দনার কণ্ঠে অপরাধবোধ নেই, বাস্তবতার ক্লান্তি। ইতিহাসের কাগজ আর অসুস্থ মানুষের ওষুধের মধ্যে বেছে নিতে হলে কাগজই হারায়।

সুধীর পুরনো কাগজের ক্রেতার নাম মনে করতে পারল না। তবে বলল, কয়েক মাস আগে মহিমের আড়তের লোক পুরনো খাতা কিনেছিল প্যাকিংয়ের জন্য। মাখনের সহকারীও মাঝে মাঝে কাগজ নেয় পুঁটলি বানাতে।

হরেন বলল, "তা হলে পৃষ্ঠা মহিম বা মাখনের কাছে।"

কুসুম সঙ্গে সঙ্গে থামাল। "সম্ভাবনা। সিদ্ধান্ত নয়।"

হরেন হাসল। "পঞ্চানন কাকার পাঠ কাজ করছে।"

কুসুম হাসল না। সে এখনও নিজের ভুলের ভার অনুভব করছে।

সেই রাতে পঞ্চাননের বাড়ির সামনে কেউ লাল সুতোয় বাঁধা একটি পুঁটলি রেখে গেল। ভেতরে ছাই আর কাগজের ছোট টুকরো। কাগজে শুধু দুটি অক্ষর: "লা"। মুছে যাওয়া নামের মাঝের অংশ হতে পারে, আবার সাধারণ কোনো শব্দের টুকরোও।

পঞ্চানন পুঁটলি পুড়িয়ে ফেললেন না। কাচের বয়ামে রেখে পরদিন স্কুলে দিলেন। বললেন, "যে ভয় দেখাতে চায়, সে আমার বিশ্বাসকে ব্যবহার করবে। আমি এবার তার সুবিধা হতে দেব না।"

জগন্নাথ কুসুমকে পাশে ডেকে বললেন, "আমি তোমাকে থামাতে পারিনি।"

"আপনি বলেছিলেন।"

"আরও জোরে বলা উচিত ছিল।"

"তাহলে হয়তো আমি আরও জোরে ভুল করতাম।"

দুজনেই কিছুক্ষণ নথির দিকে তাকিয়ে রইল। হারানো পৃষ্ঠার চেয়ে কুসুমের কাছে সেদিন নিজের বিচারবোধের ফাঁক বেশি স্পষ্ট মনে হলো।

* * *

চন্দনা রামলোচনের সঙ্গে তিন মাসের পরীক্ষাকাল শুরু করেছেন, এই খবর পঞ্চগ্রামে এমনভাবে ছড়াল যেন দুইজন মানুষ কথা বলছেন না, গ্রাম নতুন আইন পরীক্ষা করছে। রামলোচন সপ্তাহে দুই দিন চন্দনার বাড়িতে রান্না শিখতে আসেন। প্রথম দিন ডাল পুড়ল। দ্বিতীয় দিন লবণ দ্বিগুণ। তৃতীয় দিন তিনি আগেভাগে সুধীরের দোকান থেকে পেঁয়াজি কিনে এনে বললেন, “রান্না ব্যর্থ হলে বিকল্প ব্যবস্থা থাকা দরকার।”

চন্দনা বললেন, “বিকল্প ব্যবস্থা কিনে আনা সহজ। ব্যর্থতা কেন হলো, সেটা বুঝেছ?”

রামলোচন মাথা চুলকালেন। “চুলা বেশি ছিল।”

“চুলার দোষ দিলে বিয়ে হবে না।”

কুসুম পাশের ঘরে নথির কপি করছিল। হাসি চাপতে গিয়ে কলমের রেখা বেঁকে গেল।

চন্দ্রেশ সামন্তের পুরনো কাগজ নিয়ে চন্দনা সেদিন প্রথম দীর্ঘ কথা বললেন। তাঁর বাবা জমিদারবাড়ির শেষ দিকের হিসাবরক্ষকের সহকারী ছিলেন। লেখাপড়া জানতেন, নকল পরিষ্কার করতেন। জমিদারি ভেঙে যাওয়ার পরে বহু কাগজ ছড়িয়ে যায়। কেউ জ্বালানি বানায়, কেউ মুড়ি মুড়তে ব্যবহার করে, কেউ জমির সুবিধামতো পাতা সরায়। চন্দ্রেশ কিছু নথি কপি করে রেখেছিলেন। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন, মূল কাগজ যার ঘরে থাকবে, ইতিহাস তার ইচ্ছামতো বদলাবে।

“বাবা কি হরিহরদের বিরুদ্ধে ছিলেন?” কুসুম জিজ্ঞেস করল।

“মানুষকে এক বাক্যে ভাগ করিস না। তিনি হরিহরের বাবার সঙ্গে কাজও করেছেন, ঝগড়াও করেছেন। বন্যার সময় মোড়লবাড়ি চাল দিয়েছে, আবার পরে খালের জমি নিজের নামে তুলেছে। একই পরিবার ভালো কাজ আর অন্যায় দুটোই করতে পারে।”

“শৈলবালা?”

চন্দনা জানালার বাইরে তাকালেন। “বাবা বলত, তিনি কলস বানানো পরিবারের বিধবা ছিলেন। বন্যায় তাঁর ঘর ভেসে যায়। তারপর পাঁচ পাড়ার নারীদের নিয়ে জলপথ কাটার জন্য টাকা ও শ্রম জোগাড় করেন। নিজের কাঁকন বিক্রি করেছিলেন। কিন্তু নথির মূল আলোচনায় পুরুষদের নাম। তাঁর নাম শেষে সাক্ষী হিসেবে ঢুকেছিল। পরে কেউ ঘষে দেয়।”

“কেন?”

“কারণ ইতিহাসে নারীর কাজ থাকলে উত্তরাধিকার আর সম্মানের হিসাব বদলায়। যে জমি কিনতে তাঁর গয়না গেছে, সেটাকে এক পরিবারের দান বলা যায় না।”

রামলোচন চুলার পাশে নীরবে বসেছিলেন। তিনি বললেন, “আমাদের বাড়িতে শুনেছি, খাল মোড়লদের দয়া।”

চন্দনা তাকালেন। “শোনা কথাও কার সুবিধায় টিকে আছে, দেখো।”

কুসুম কলেজের ফর্মের কথা তুলল। চন্দনা বললেন, তাঁর মশলার কাজের হিসাব কুসুম ছাড়া চলতে পারে। মাকে দেখার দায়িত্ব ভাগ করা যাবে। রামলোচন বললেন, বাজারের দিনে ওষুধ এনে দেবেন।

কুসুম অস্বস্তি পেল। “আমার জন্য তোমাদের সম্পর্কের ওপর কাজ চাপবে না।”

চন্দনা হেসে বললেন, “তুই ভাবছিস শুধু তুই অন্যের দায়িত্ব নেবি। অন্যরা তোরটা নিলে স্বাধীনতা কমে যায়?”

কুসুম উত্তর পেল না।

সেই বিকেলে তারা তিনজনে চন্দ্রেশের পুরনো ঘরের মাচা দেখল। বাঁশের ওপর ধুলো, ভাঙা ঝুড়ি, মাটির কলস। একটি কলসের তলায় কাপড়ের ছোট থলি। ভেতরে পিতলের আরেকটি পিন, মাথায় পাঁচ গর্ত, এবং অর্ধেক ছেঁড়া ছবির অংশ। ছবিতে

কোদাল হাতে নারীদের পায়ের দিক। ওপরের অংশ নেই। নন্দলালের ছবির নিচের অংশ হতে পারে।

পিনটির সঙ্গে একটি ছোট কাগজ: “পূর্ণ কপি ফুলমতির বাবার কাছে দেওয়া।”

ফুলমতি নামটি পড়ে চন্দনা বললেন, “আমি এই নাম শুনেছি। হরিহর যখন তরুণ, এক সেলাইকার পরিবারের মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল। পরে পরিবার তাকে সরিয়ে দেয়।”

কুসুম বলল, “বিয়ে?”

“কেউ বলত হয়েছে, কেউ বলত হয়নি। মেয়েটি আর ফিরে আসেনি।”

রামলোচন দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। “গ্রাম পুরুষের সম্পর্ককে গল্প করে, নারীর জীবনকে লজ্জা বানায়।”

চন্দনা তাঁর দিকে তাকালেন। “এই বাক্য মনে রেখো। পরে নিজের কাজে লাগবে।”

ছবির টুকরো নন্দলালের ছবির সঙ্গে মিলল। দুই অংশের ছেঁড়ার রেখা পুরোপুরি নয়, কিন্তু একই ছবির আলাদা কপি হতে পারে। নন্দলাল জানালেন, তাঁর কপিটি কলকাতার এক পুরনো অ্যালবাম থেকে পাওয়া। পেছনের লেখাটি সম্ভবত চন্দ্রেশের।

“ফুলমতির বাবার নাম জানেন?” কুসুম জিজ্ঞেস করল।

নন্দলাল নোট দেখে বললেন, “নৃপেন দে। জেলা শহরে সেলাইয়ের দোকান ছিল। তাঁর মেয়ের বর্তমান ঠিকানা পাওয়া যায়নি।”

হরেন বলল, “ডাকঘর থেকে খোঁজ করা যায়।”

“পুরনো ঠিকানা আছে,” নন্দলাল বললেন। “চিঠি পাঠানো যায়।”

কুসুম একটি চিঠি লিখল। ভাষা সংক্ষিপ্ত। পঞ্চগ্রামে পুরনো দলিল পাওয়া গেছে, নৃপেন দের কাছে কপি ছিল বলে সূত্র আছে, ফুলমতি দে যদি এই চিঠি পান, যোগাযোগ করুন। কোনো ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা লিখল না। মানুষের গোপন জীবনকে সূত্র হিসেবে ব্যবহার করা যায়, প্রদর্শনী হিসেবে নয়।

চিঠি ডাকবাক্সে ফেলার সময় হরেন বলল, “উত্তর আসতে কত দিন?”

“যদি ঠিকানা থাকে, সাত থেকে দশ দিন।”

“ফোন থাকলে?”

“নম্বর নেই।”

“প্রযুক্তির সীমা বুঝছি।”

কুসুম বলল, “অপেক্ষারও কাজ আছে। মানুষকে ভাবার সময় দেয়।”

সেই রাতে চন্দনা রামলোচনের রান্না করা ডাল খেয়ে বললেন, “আজ খাওয়া যাচ্ছে।”

রামলোচনের মুখে এমন আনন্দ এল, যেন বিয়ের দিন ঠিক হয়েছে। চন্দনা সঙ্গে সঙ্গে যোগ করলেন, “এটি অনুমোদন নয়। অগ্রগতি।”

কুসুম মনে মনে ভাবল, নথি পড়া আর সম্পর্ক পড়ার মধ্যে মিল আছে। একটি ভালো লাইন দেখে পুরো কাগজ সত্যি ধরে নেওয়া যায় না। ধারাবাহিকতা দেখতে হয়।

* * *

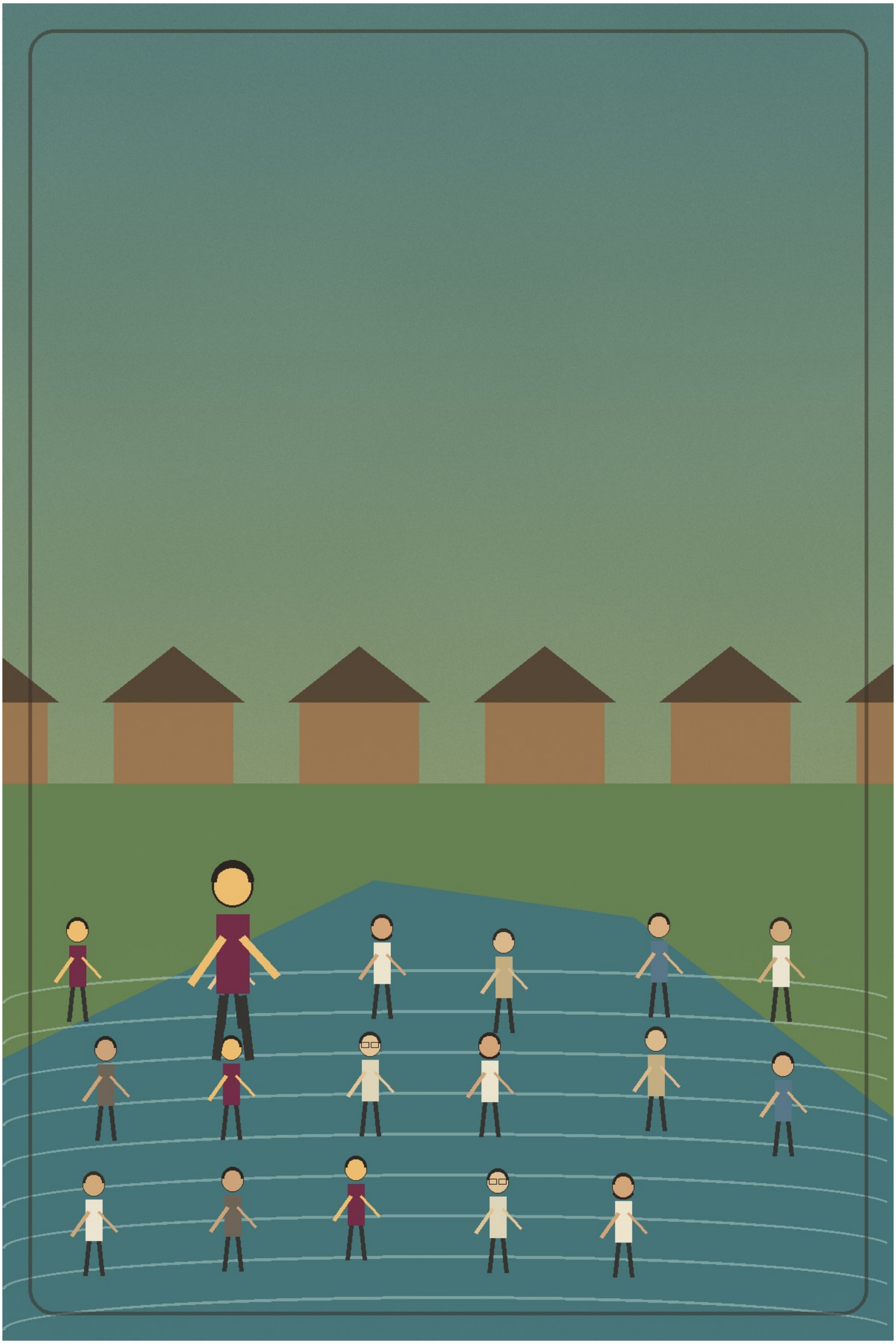

১৬. পানির পথ

ভাদ্রের শুরুতে বৃষ্টি কয়েকদিন কমল। মাঠে জমা জল ধীরে নামছে, কিন্তু কলাবাগানের নিচু অংশে জল দাঁড়িয়ে রইল। পুরনো খালের মুখে নতুন মাটির বাঁধ আরও উঁচু। মহিমের লোকেরা বলল, বর্ষার পরে রাস্তা হবে। কুসুম দেখল, রাস্তার জন্য মাটি ফেলা হয়েছে আড়াআড়ি, জলনিকাশির কোনো নল নেই।

নন্দলাল মানচিত্রের নীল রেখা অনুসরণ করে হাঁটার প্রস্তাব দিলেন। সঙ্গে কুসুম, জগন্নাথ, হরেন, গোপাল, জহুরা খাতুন এবং পঞ্চানন। হরিহরকে জানানো হয়েছিল। তিনি বললেন, হাঁটু ব্যথা, তবে কাজের ফল জানাতে।

বটগাছের পশ্চিম শিকড় থেকে পুরনো ইটের নালা শুরু। কিছু দূরে মাটির নিচে যায়। হরেন লম্বা বাঁশ ঢুকিয়ে গভীরতা দেখল। এক জায়গায় বাঁশ হঠাৎ নেমে গেল, নিচে ফাঁকা। গোপাল মাটি সরিয়ে ক্ষুদ্র গম্বুজের মতো ইটের নালা বের করল। জল এখনও ধীরে বইছে।

পঞ্চানন ছড়ার লাইন বললেন, “পাঁচ হাত পরে বাঁক, সাত হাত পরে মুখ।”

জগন্নাথ মাপ নিয়ে দেখলেন, প্রথম বাঁক প্রায় পাঁচ হাত দূরে। তিনি বললেন, “ছড়াটি ব্যবহারিক নির্দেশও হতে পারে।”

পঞ্চানন হেসে বললেন, “সব ছড়া শিশু ঘুম পাড়ায় না।”

পথটি কলাবাগানের পেছন দিয়ে পটলপাড়ার মাঠের দিকে গেছে। মাঝখানে তিন জায়গায় বাঁধ। একটি বহু পুরনো, গাছের শিকড়ে ভরা। দ্বিতীয়টি পঞ্চাশ বছরের মতো পুরনো ইটের দেয়াল। তৃতীয়টি একেবারে নতুন লাল মাটি ও বাঁশে। নতুন বাঁধের পাশে মহিমের বস্তা, মাখনের লাল সুতোর টুকরো এবং অর্ধচন্দ্র ছাপের চটি।

গোপাল চটি তুলে বলল, “এবার অর্ধেক চাঁদের মানুষ পুরো হলো।”

চটি মহিমের শ্রমিক রতনের। তাকে ডাকা হলে সে প্রথমে বলল, চটি হারিয়েছে। পরে স্বীকার করল, গোলাপীকে সে বেঁধেছিল। কারণ হাঁসটি বারবার খনন করা মাটিতে ঢুকে পড়ছিল এবং কাজ নষ্ট করছিল। মহিম তাকে খাল বন্ধ করতে বলেননি, শুধু জমি সমান করতে বলেছেন। মাখনের কানাই বলেছিল, মানুষ এলে ভয় দেখাতে।

"কার নির্দেশে?" কুসুম জিজ্ঞেস করল।

রতন বলল, "মহিমবাবু আর মাখনদা কথা বলেছিল। আমি দূরে ছিলাম।"

মহিম সব অস্বীকার করল। সে বলল, শ্রমিক নিজের সুবিধায় কাজ করেছে। রাস্তা তৈরির প্রাথমিক অনুমতি হরিহর দিয়েছেন।

হরিহর এবার হাটতলায় এলেন। "আমি শুকনো মৌসুমে রাস্তার কথা বলেছিলাম। খাল বন্ধ করার নয়।"

রতন বলল, "মহিমবাবু বলেছিল মোড়লের অনুমতি আছে।"

মহিম রেগে উঠল। "দিনমজুরের কথা দিয়ে আমাকে দোষী করবেন?"

জহুরা বললেন, "দিনমজুরের হাত দিয়ে কাজ করালে তার কথা শুনতেও হবে।"

নন্দলাল নতুন বাঁধের মাপ নিলেন। হিসাব করে বললেন, বড় বৃষ্টি ও উজানের জল একসঙ্গে এলে এখানে চাপ বাড়বে। পুরনো নালা সরু, নতুন বাঁধ জল ফিরিয়ে দেবে কলাবাগান ও পটলপাড়ায়।

জগন্নাথ বললেন, "বর্ষার শেষ পূর্ণিমায় নদীর জলও বাড়তে পারে। চিঠির সতর্কবার্তা বাস্তব।"

কুসুম মানচিত্রে দেখল, "জল তার পুরনো পথ চাইবে" কেবল কাব্য নয়। পথ বন্ধ হলে জল ঘর, মাঠ, রাস্তা ভেঙে নিজেই পথ বানায়।

হরিহর বললেন, "বাঁধ খুলতে হলে সরকারি অনুমতি লাগবে। ভুল করে কারও জমি ক্ষতি হলে দায় কে নেবে?"

"জল ঢুকে ঘর ভাঙলে দায়?" জহুরা জিজ্ঞেস করলেন।

হরিহর উত্তর দিলেন না।

কুসুম বুঝল, তাঁর ভয় শুধু বংশগৌরব নয়। জমির নথি, ইজারা, ক্ষতিপূরণ, সম্ভাব্য মামলা, সব তাঁর মাথায়। তিনি জানেন কিছু ভুল হয়েছে, কিন্তু একবার প্রকাশ্যে মেনে নিলে কর্তৃত্ব ভাঙবে।

নন্দলাল প্রস্তাব দিলেন, অবিলম্বে ব্লক অফিসে জরুরি পরিদর্শনের আবেদন, গ্রামের মাপজোক, পুরনো নথির কপি এবং নতুন বাঁধের ছবি পাঠানো হোক। হরেন ফোনে ছবিগুলো গুছিয়ে দিল। জগন্নাথ আবেদন লিখলেন। কুসুম কলাবাগান ও পটলপাড়ার সই সংগ্রহ করল। হরিহর সই করতে দেরি করলেন। শেষে লিখলেন, "পরিদর্শন প্রয়োজন", কিন্তু "জরুরি" শব্দটি কেটে দিলেন।

কুসুম কাটা শব্দের দিকে তাকাল। "কেন?"

"অযথা আতঙ্ক হবে।"

"চিঠির আতঙ্ক বিক্রি হচ্ছে। জলের ঝুঁকি লিখলে আতঙ্ক?"

"প্রশাসনের ভাষা বুঝে লিখতে হয়।"

নন্দলাল বললেন, "ঝুঁকি কম লিখলে প্রশাসন দেরি করবে।"

হরিহর কলম নামিয়ে দিলেন। "আমার নামে আবেদন যাবে। ভাষা আমি ঠিক করব।"

কুসুম অন্য একটি আবেদন লিখল, পাঁচ পাড়ার বাসিন্দাদের নামে। সেখানে "জরুরি" রইল। জগন্নাথ প্রথমে দ্বিধা করলেন। মোড়লের সঙ্গে প্রকাশ্য বিরোধ বাড়বে। পরে সই করলেন।

আবেদন পাঠানোর দুই দিন পরে ব্লক অফিস থেকে ফোন এল, পরিদর্শক দশ দিনের মধ্যে আসবেন। বর্ষার শেষ পূর্ণিমা আর তিন সপ্তাহ দূরে।

সেই রাতে পুরনো খালের নতুন বাঁধে কেউ কোদাল চালিয়েছে। পুরো খোলেনি, শুধু মাঝখানে ছোট ফাটল। সকালে ফাটল দিয়ে সরু জল বেরোচ্ছিল। পাশে পাঁচটি কড়ি নয়, পাঁচটি শামুকের খোল সাজানো।

হরিহর বললেন, “এটা বেআইনি।”

জহুরা বললেন, “জলও কি অনুমতি নিয়ে বেরোয়?”

কেউ স্বীকার করল না। কুসুম ফাটলের ধারে বিনাপিসির পুরনো ধূসর শালের একটি সুতো দেখতে পেল। নিশ্চিত হওয়ার আগেই জল সেটি ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

* * *

মানুষ মুখ ঢাকে লজ্জায়, ক্ষমতা মুখ ঢাকে প্রয়োজনের নামে।

১৭. সোনালি বালিশ

মোড়লবাড়ির দোতলার দক্ষিণ ঘর নিয়ে পঞ্চগ্রামে বহুদিনের গল্প ছিল। সেখানে নাকি সোনার মোহর, রুপোর পানপাত্র, জমিদারি আমলের বন্দুক এবং একটি সোনার বালিশ রাখা আছে। এই চারটির মধ্যে বন্দুকের কথা হরিহর নিজে অস্বীকার করেছিলেন। ফলে গ্রামের যুক্তি অনুযায়ী বাকি তিনটি সত্য হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

হরেন ছোটবেলা থেকে ঘরটিতে ঢুকেছে, কিন্তু আলমারির ওপরের তাক আর কাঠের সিন্দুক কখনো খোলেনি। সোনার বালিশ বলতে যা দেখেছে, তা আসলে সোনালি কাপড়ে ঢাকা একটি লম্বা বালিশ। বিনাপিসি বলেন, হরিহরের বাবা কোমরের ব্যথায় সেটি ব্যবহার করতেন। ভোলা দা বলেন, সোনার সুতো দিয়ে সেলাই করা। গোপাল বলেন, সোনা হলে মাথা রাখলে ঘাড় ব্যথা করত।

লোহার বাক্সের নথিতে মোড়লবাড়ির পুরনো গুদামের উল্লেখ পাওয়ার পরে হরেনের কৌতূহল বাড়ল। বিনাপিসি একদিন বলেছিলেন, আগুনের পরে কিছু হিসাব "ঘুমের জিনিসে" লুকানো হয়েছিল। ঘুমের জিনিস বলতে বালিশও হতে পারে।

কুসুমকে বললে সে নিশ্চয় অনুমতি নিতে বলবে। হরিহর অনুমতি দেবেন না। তাই হরেন এমন একটি দুপুর বেছে নিল, যখন হরিহর ব্লক অফিসে, বিনাপিসি পাশের বাড়িতে, দাসু বাজারে।

দক্ষিণ ঘরের তালা তার কাছে থাকা পুরনো চাবিতে খুলল না। মোবাইল মেরামতের পাতলা স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে সে কপাটের আটকানো হুক সরাল। কাজটি করতে করতে নিজের কাছে যুক্তি দিল, এটি ব্যক্তিগত কৌতূহল নয়, গ্রামের ইতিহাস। যে মানুষ নিজের ভুলকে বড় নামে ডাকে, তার হাত সাধারণত দ্রুত চলে।

ঘরে ধুলো, কর্পূর এবং পুরনো কাপড়ের গন্ধ। প্রথম চিঠির মতো। আলমারিতে জমির খতিয়ান, ঋণের কাগজ, কিছু ছবি। বালিশটি সিন্দুকের ওপর। সোনালি কাপড় ফিকে হয়ে বাদামি। এক প্রান্তের সেলাই নতুন।

হরেন ছুরি ব্যবহার করল না। সুতো খুলে ভেতরের তুলো সরাতেই শক্ত কাগজের শব্দ। কাপড়ে মোড়া কয়েকটি হিসাবপাতা। ওপরের পাতায় ১৯৬৭ সালের তারিখ, দক্ষিণের জলমুখে "মাটি ভরাট ও সীমানা সংশোধন" বাবদ খরচ। পাশে হরিহরের বাবার স্বাক্ষর। দ্বিতীয় পাতায় চন্দ্রেশ সামন্তের হাতে লেখা আপত্তি: "সাধারণ নালার জমি ব্যক্তি খতিয়ানে তোলা অনুচিত।" নিচে লাল কালি দিয়ে লেখা, "আপত্তি প্রত্যাহৃত।" কিন্তু চন্দ্রেশের স্বাক্ষর নেই।

তৃতীয় পাতার অর্ধেক ছেঁড়া। সেখানে "ফুলমতি দে" এবং "নৃপেন দে কর্তৃক সংরক্ষিত কপি" পড়া যায়।

হরেনের বুক ধুকপুক করতে লাগল। সে কাগজগুলো ফোনে তুলল। আলো কম, ছবি ঝাপসা। জানালার কাছে নিতে গিয়ে পেছনে দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ শুনল।

হরিহর দাঁড়িয়ে। তাঁর হাতে পিতলের ঘড়ি, মুখে কোনো গোঁফের ভঙ্গি নেই। শুধু ক্লান্ত রাগ।

"চুরি করতে শিখলি?"

হরেন বলল, "আমি কাগজ খুঁজছিলাম।"

"আমার ঘরে তালা খুলে?"

"এগুলো গ্রামের কাগজ।"

"বালিশ আমার বাবার।"

"কাগজে সাধারণ খালের কথা।"

হরিহর এগিয়ে এসে কাগজ নিলেন। হাত কাঁপছিল। "তুই জানিস না পরিবারের কী অবস্থা ছিল। বন্যার পরে ঋণ, মামলা, জমি বিক্রি। তোর বাবার পড়াশোনা, আমার ব্যবসা, সব এই বাড়ির ওপর। কাগজে যা লেখা আছে, তার পেছনে জীবন আছে।"

"কলাবাগানের ঘরেও জীবন আছে।"

বাক্যটি বলেই হরেন ভয় পেল। হরিহর চড় মারতে পারেন। তিনি মারলেন না। ধীরে বললেন, "কুসুমের ভাষা শিখেছিস।"

"ভাষা সত্যি হলে কার, তাতে কী?"

"সত্যি পুরোটা জানিস?"

"আপনি বলুন।"

হরিহর দীর্ঘ সময় চুপ। তারপর কাগজগুলো আবার বালিশে ভরলেন না। টেবিলে রাখলেন। "আমার বাবা জলমুখের জমি নিজের নামে তুলেছিলেন। বলেছিলেন, দেখাশোনা না করলে বাইরের লোক নেবে। চন্দ্রেশ আপত্তি করেছিল। পরে টাকার দরকারে আপত্তি তুলে নেয়।"

"স্বাক্ষর নেই।"

"মৌখিক সম্মতি ছিল।"

"কাগজে লিখেছে কে?"

হরিহর উত্তর দিলেন না।

"ফুলমতি কে?" হরেন জিজ্ঞেস করল।

হরিহর এবার তার দিকে তাকালেন। চোখে রাগের বদলে ভয়। "এই নাম নিয়ে বাইরে একটি কথা বলবি না।"

"কেন?"

"কারণ সব সত্যি জনতার সম্পত্তি নয়।"

হরেন বলল, “কিন্তু অন্যের জীবন মুছে নিজের সম্মান রাখলে?”

হরিহর টেবিলে হাত রাখলেন। “তুই আমার কাছে মানুষ হয়েছিস। তোর বাবা মারা যাওয়ার পরে কে পড়িয়েছে, কে চিকিৎসা করিয়েছে?”

“আপনি। তাই বলে ভুল দেখতে পাব না?”

বাক্যটির পরে ঘরে এমন নীরবতা হলো, যেন সম্পর্কের ভেতরেও একটি তালা ভাঙল।

হরেন কাগজের ছবি মুছল না। কিন্তু কুসুমকে দেওয়ার আগে হরিহরকে জানাল। “আমি ছবি রেখেছি। নথির দলের সামনে দেখাব। গোপনে ছড়াব না।”

হরিহর বললেন, “তুই আজ আমার বিশ্বাস ভেঙেছিস।”

“আপনিও গ্রামের।”

হরেন নিচে নেমে এল। উঠোনে গোলাপী তাকে দেখে ডাকল, তারপর দোতলার দিকে তাকাল। হাঁসের বিচার সহজ। যে খাবার দেয় সে ভালো, যে ধরে সে খারাপ। মানুষের সম্পর্ক সেই সুবিধা দেয় না।

সন্ধ্যায় নথির সামনে কাগজগুলো খোলা হলো। হরেন নিজের অনধিকার প্রবেশ স্বীকার করল। কুসুম বলল, “সূত্র গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু যেভাবে পাওয়া হয়েছে তা ভুল। আমরা তথ্য ব্যবহার করব, হরেনের কাজকে সঠিক বলব না।”

হরেন মাথা নেড়ে মেনে নিল। জগন্নাথ বললেন, “গোপন কাগজ ইতিহাস হতে পারে, তবু ব্যক্তিগত ঘরে ঢোকার নিয়ম তৈরি করা যাবে না।”

হরিহর সভায় এলেন না। বিনাপিসি দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে সব শুনলেন। ফেরার সময় কুসুমকে বললেন, “বালিশে কাগজ রেখেছিল আমার দাদা। ঘুমাতে পারেনি বলেই হয়তো ঘুমের নিচে রাখত।”

“আপনি জানতেন?”

“কিছুটা।”

“প্রথম চিঠি?”

বিনাপিসি উত্তর না দিয়ে বললেন, “সব প্রশ্ন এক দিনে করলে উত্তরও একদিনে শেষ হয়ে যায়।”

কুসুম তাঁর ধূসর শালের দিকে তাকাল। নিচের প্রান্তে একটি সুতো ছেঁড়া।

* * *

মাখন ঠাকুর ঘোষণা করল, আশ্বিনের পূর্ণিমার আগে “পাঁচদ্বার শান্তি আসর” হবে। স্থান পুরনো খালের ধারের উঁচু জমি। কারণ সেখানেই অশান্তির কেন্দ্র। পরিবারপিছু ন্যূনতম দশ টাকা, সামর্থ্য অনুযায়ী বেশি। বিশেষ সুরক্ষা চাইলে পিতলের পাত আলাদা।

জগন্নাথ বললেন, “সরকারি পরিদর্শনের আগে জমিতে ভিড় করা বিপজ্জনক।”

মাখন উত্তর দিল, “মানুষ ভয় পাচ্ছে। আপনি কাগজ দেখান, আমি শান্তি দিই।”

পঞ্চানন প্রকাশ্যে বললেন, “শান্তি ভয় বাড়িয়ে কেনা যায় না। আর সাধারণের জলপথে ব্যক্তিগত আসর বসবে না।”

মাখন হেসে বলল, “আপনি পুরনো পদ্ধতির মানুষ। যুগ বদলেছে।”

পঞ্চানন বললেন, “প্রতারণার পদ্ধতি বদলালেই যুগ বদলায় না।”

এই বিরোধ পঞ্চগ্রামের জন্য নতুন। যারা পঞ্চাননকে জগন্নাথের বিপরীত ভাবত, তারা দেখল, ঐতিহ্যের নামে ব্যবসা আর ঐতিহ্যের স্মৃতি এক নয়।

আসরের দিন সন্ধ্যায় শতাধিক মানুষ জমল। লাল কাপড়ের তোরণ, ধোঁয়া, পিতলের থালা, পাঁচ কোণে প্রদীপ। মাখনের সহকারীরা একই লাল সুতো বিভিন্ন নামে বিক্রি করছিল। কারও জন্য জলভয় নিবারণ, কারও জন্য জমি রক্ষা, কারও জন্য রোগ প্রতিরোধ। সুধীর একটি সুতো কিনে তিনটি কাগজে নাম লিখে বলল, “একই জিনিস তিন দামে কেন?”

সহকারী বলল, “মন্ত্র আলাদা।”

“সুতো শুনেছে?”

আসরের ভিড় হাসল। মাখন সুধীরকে চুপ থাকতে বলল।

কুসুম, হরেন ও নন্দলাল ভিড়ের বাইরে দাঁড়িয়ে ছবি তুলছিল। মহিম সর্দার মঞ্চের পেছনে মাখনের সঙ্গে কথা বলল। নন্দলালের ক্যামেরায় মুহূর্তটি ধরা পড়ল। মহিম একটি খাম দিল। মাখন খাম উত্তরীয়ের ভাঁজে রাখল।

"এটা ঘুষের প্রমাণ নয়," জগন্নাথ বললেন, ছবি দেখে।

"না," কুসুম বলল। "কিন্তু সম্পর্কের প্রমাণ।"

মাখন আসর শুরু করে বলল, পূর্ণিমার রাতে জল উঠলেও সুরক্ষিত পরিবার ক্ষতি পাবে না। যারা অংশ নেয়নি, তাদের দায় নিজের। এই কথায় কলাবাগানের মানুষ ক্ষুব্ধ হলো। জহুরা উঠে বললেন, "জল পাড়ার নাম দেখে ঢোকে না। দশ টাকা দেখে ঘর বাঁচালে তোমার প্রদীপকে বাঁধে বসাও।"

মাখন বলল, "অবিশ্বাস করলে ফল পাওয়া যায় না।"

জহুরা উত্তর দিলেন, "ফল না হলে অবিশ্বাসের দোষ, হলে তোমার কৃতিত্ব। ভালো ব্যবসা।"

পঞ্চানন মঞ্চের সামনে গিয়ে লাল সুতো খুলে দেখালেন। গিঁটটি কানাইয়ের বাঁশের যন্ত্রে পাওয়া সুতোর মতো। "এই গিঁট ভয় দেখানোর যন্ত্রেও ছিল। মানুষকে খাল থেকে দূরে রাখতে তোমার লোক কাজ করেছে।"

মাখন বলল, "কানাই আমাকে বদনাম করেছে।"

কানাই ভিড়ের মধ্যে ছিল। সে কাঁপা গলায় বলল, "আপনি বলেছিলেন, মহিমবাবুর জমিতে কেউ গেলে ভয় দেখাতে।"

মহিম চেঁচিয়ে উঠল, "মিথ্যে।"

নন্দলাল ছবি দেখালেন। "আজকের খামটি কী?"

মহিম বলল, "দানের টাকা।"

"কিসের জন্য?"

“সামাজিক কাজ।”

“হিসাব আছে?”

মাখন উত্তর দিল না।

হরেন তার রেকর্ড করা শব্দ বাজাল। তালগাছের বাঁশের নল, “ফিরে যা”, এবং শেষে ঘণ্টা। কানাই স্বীকার করল প্রথম দুটি তার। ঘণ্টা নয়। মাখন বলল, সে ঘণ্টার শব্দকে অশরীরী সংকেত মনে করে।

সেই মুহূর্তে গোলাপী মঞ্চের পেছনে ঢুকে ধাক্কা দিয়ে একটি ঢাকা ঝুড়ি ফেলে দিল। ঝুড়ি থেকে পাঁচটি ছোট পিতলের ঘণ্টা গড়িয়ে পড়ল। একটির স্বর হরেনের রেকর্ডের মতো।

হাটতলায় পরে ভোলা দা বলেছিলেন, গোলাপী পরিকল্পিতভাবে প্রমাণ উদ্ধার করেছে। বাস্তবে সে ঝুড়ির মধ্যে রাখা চালের গন্ধ পেয়েছিল। তবু ফল একই।

মাখন দাবি করল, ঘণ্টাগুলো আসরের জন্য। কিন্তু কানাই বলল, আগের রাতেও একটি ঘণ্টা খালের পাশে রাখা হয়েছিল। বাতাসে সুতো টানলে বাজে। মানুষকে আরও দূরে রাখতে।

জগন্নাথ বললেন, “এবার থানায় অভিযোগ হবে।”

হরিহর উপস্থিত ছিলেন। তিনি অনেকক্ষণ নীরব থেকে বললেন, “প্রতারণা ও জনসাধারণের পথ আটকানোর অভিযোগ লিখুন। কিন্তু জনতা কাউকে মারবে না।”

মাখনের কয়েকজন ক্রেতা টাকা ফেরত চাইল। সে সঙ্গে সঙ্গে দিতে পারল না। সুধীর প্রস্তাব দিল, সবার নাম ও টাকার পরিমাণ লিখে তালিকা হোক। মাখন বাধ্য হয়ে স্বাক্ষর করল।

মহিম খামের বিষয়ে বলল, সেটি গুদামের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আগাম অনুদান। নন্দলাল বললেন, গুদাম অনুমোদিতই হয়নি। মহিম উত্তর দিল, “হবে।”

কুসুম বুঝল, ভয় ব্যবসা কেবল মাখনের নয়। মহিম জমি সস্তা ও বিরোধহীন রাখতে ভয় চেয়েছে। হরিহর উন্নয়ন ও পরিবারের আর্থিক চাপের মধ্যে নীরব থেকেছেন। যারা সুতো কিনেছে, তারাও কেবল অজ্ঞ নয়। তারা অনিশ্চয়তার মধ্যে নিশ্চিত কিছু কিনতে চেয়েছে। প্রতারণা এই আকাঙ্ক্ষার পথেই ঢোকে।

আসর ভেঙে যাওয়ার পরে পঞ্চানন প্রদীপের আগুন নিভিয়ে দিলেন। জগন্নাথ বললেন, “আজ আপনি আমার চেয়ে বেশি যুক্তিবাদী।”

পঞ্চানন হেসে বললেন, “আজ? বাকি দিনগুলো হিসাব করে বলবেন।”

কুসুম দেখল, দুই মানুষ একে অপরকে বদলাচ্ছেন। গ্রামের বড় পরিবর্তন হয়তো এমনই, কোনো ঘোষণা ছাড়া।

* * *

১৯. শিবুর ভুল

গহর তালগাছের মৌমাছির কামড় থেকে বেঁচে ফিরেছিল স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসায়। মুখের ফোলা কমেছে, কিন্তু শ্বাসকষ্টের ভয় তাকে বদলে দিয়েছে। সে আর রাতে মধু তুলতে যায় না। শিবুও বদলাতে চেষ্টা করছিলেন, যদিও কথায় স্বীকার কম। দোকানের সামনে নতুন কাগজ ঝুলিয়েছেন: “প্রাথমিক সাহায্য ও সাধারণ ওষুধ।” আগের “সব রোগের চিকিৎসা” লেখা বোর্ডটি উল্টো করে রাখা।

এক সকালে মোল্লাপাড়ার বৃদ্ধ রহিম শেখ বুকে চাপ ও ঘাম নিয়ে শিবুর দোকানে এলেন। শিবু নাড়ি ধরলেন, পুরনো অভ্যাসে বলার জন্য মুখ খুললেন, “গ্যাস।” তারপর ঝিলিকের মুখ, গহরের ফুলে যাওয়া গলা এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসকের সতর্কতা মনে পড়ল।

তিনি রহিমকে জিজ্ঞেস করলেন, ব্যথা হাতে ছড়াচ্ছে কি না। উত্তর হ্যাঁ। শ্বাস কষ্ট কি না। হ্যাঁ। শিবুর হাত ঠান্ডা হলো। তাঁর ব্যাগে অ্যান্টাসিড, ব্যথার ট্যাবলেট, ইনজেকশন। কোনোটিই নিশ্চিত সমাধান নয়।

“হরেনকে ডাকো,” তিনি সুধীরকে বললেন। “ভ্যান লাগবে। এখনই স্বাস্থ্যকেন্দ্র।”

রহিমের ছেলে বলল, “একটা ওষুধ দিন। পথ দূর।”

শিবু কঠিন গলায় বললেন, “ওষুধ দিয়ে বসিয়ে রাখলে ক্ষতি হতে পারে। দ্রুত নিয়ে চলুন।”

ভ্যান আসতে সময় লাগছিল। হরেন ফোনে ব্লক অ্যাম্বুল্যান্সের নম্বর পেল, কিন্তু গাড়ি অন্য গ্রামে। শিবু রহিমকে শুইয়ে আঁটসাঁট জামা ঢিলা করলেন, অল্প পানি দিলেন না, কারণ বমির ভাব। তিনি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ওষুধ সহকারীকে ফোন করে নির্দেশ নিলেন। প্রথমবার তিনি কারও সামনে গোপন করলেন না যে পরামর্শ নিচ্ছেন।

জগন্নাথ এসে বললেন, “কী হয়েছে?”

“হার্টের সমস্যা হতে পারে। নিশ্চিত নই।”

“আপনি নিশ্চিত নন?”

শিবু তাঁর দিকে তাকালেন। আগের শিবু এই প্রশ্নে অপমানিত হতেন। আজ বললেন, “নিশ্চিত না বলেই পাঠাচ্ছি।”

রহিম হাসপাতালে পৌঁছে চিকিৎসা পেলেন। চিকিৎসক জানালেন, হৃদ্‌যন্ত্রের গুরুতর সমস্যা শুরু হয়েছিল। দ্রুত পাঠানোয় সময় বাঁচে। কয়েকদিন পরে তিনি ফিরলেন। তাঁর পরিবার শিবুকে ধন্যবাদ দিতে এলে শিবু বললেন, “আমি চিকিৎসা করিনি। বিপদ চিনে পাঠিয়েছি।”

সুধীর বলল, “সেটাও কাজ।”

শিবু দোকানের পুরনো বোর্ডটি ভেঙে ফেললেন। তবে আত্মগর্ব পুরো যায়নি। নতুন বোর্ডে লিখলেন, “প্রাথমিক সাহায্যে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা।” কুসুম দেখে বলল, “দীর্ঘ থাক। সীমা যেন ছোট না হয়।”

শিবু মৃদু হাসলেন। “তুমি আমাকে ছাড়বে না?”

“আপনি রোগীকে ছাড়বেন না, আমি আপনাকে ছাড়ব না।”

এই পরিবর্তনের মাঝেই ঝিলিকের বাবার রাগ আবার সামনে এল। নিতাই দাবি করল, শিবুর ভুল ওষুধের জন্য ক্ষতিপূরণ চাই। গ্রামের কয়েকজন বলল, শিবুকে দোকান বন্ধ করতে হবে। হরিহর পঞ্চায়েত সভায় বিষয় তুললেন।

শিবু দাঁড়িয়ে বললেন, “আমি ভুল করেছি। জল কম দিতে বলেছিলাম, যা ক্ষতিকর। ওষুধের বোতলে কী ছিল, স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পরীক্ষা হয়েছে। বিপজ্জনক নিষিদ্ধ কিছু নয়, কিন্তু শিশুর রোগ না বুঝে দেওয়া ভুল। আমি চিকিৎসক নই। ওষুধের দোকানতে কাজ শিখেছি। এখন থেকে প্রেসক্রিপশন ছাড়া ওষুধ দেব না, জরুরি লক্ষণ লিখে রাখব এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠাব।”

এই স্বীকারোক্তিতে সভা স্তব্ধ। ভোলা দা পরে বলেছিলেন, তিনি জীবনে প্রথমবার কোনো মানুষকে নিজের ভুল এত কম শব্দে বলতে শুনেছেন।

জগন্নাথ প্রস্তাব দিলেন, স্কুলে মাসে একদিন স্বাস্থ্য সচেতনতা শিবির হবে। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কর্মী আসবেন। শিবু আয়োজন করতে সাহায্য করবেন, তবে চিকিৎসক পরিচয়ে নয়। নিতাইয়ের পরিবারকে ঝিলিকের চিকিৎসা খরচের একটি অংশ শিবু ফেরত দেবেন। দোকান বন্ধ নয়, কাজের সীমা লিখিত থাকবে।

হরিহর বললেন, “জনতার রাগে মানুষকে তাড়ালে পরেরবার কেউ ভুল স্বীকার করবে না।”

কুসুম তাঁর দিকে তাকাল। কথাটি কি শুধু শিবুর জন্য, না নিজের জন্যও, বোঝা গেল না।

সভা শেষে শিবু জগন্নাথকে বললেন, “আপনি আমাকে বহুবার অপমান করেছেন।”

জগন্নাথ চুপ।

“কিছু কথা সত্যি ছিল,” শিবু বললেন। “তবু অপমান করলে আমি আরও জেদি হয়েছি।”

জগন্নাথ ধীরে বললেন, “আমি ঠিক কথা ভুলভাবে বলেছি।”

“তাহলে আপনারও বোর্ড বদলানো দরকার।”

দুজনেই হাসলেন।

গ্রামের গুজব এবার অদ্ভুতভাবে কাজ করল। কয়েকদিনের মধ্যে খবর ছড়াল, শিবু নাকি এখন শুধু কঠিন রোগ চিনে শহরে পাঠান। তাঁর দোকানে রোগী কমেনি, বরং কেউ কেউ আগে পরামর্শ নিতে আসে। তিনি প্রতিবার বলেন, “আমি ডাক্তার নই।” প্রথমদিকে কথাটি বলতে গলা আটকে যেত। পরে সহজ হলো।

একটি সমাজে মানুষের পরিচয় বদলানো কাগজের খতিয়ান বদলানোর মতোই কঠিন। তবু শিবুর ছোট বোর্ডটি প্রমাণ করল, কখনো কখনো পুরনো নামের ওপর নতুন লেখা সম্ভব, যদি আগের ভুল মুছে ফেলার বদলে তা মনে রাখা যায়।

* * *

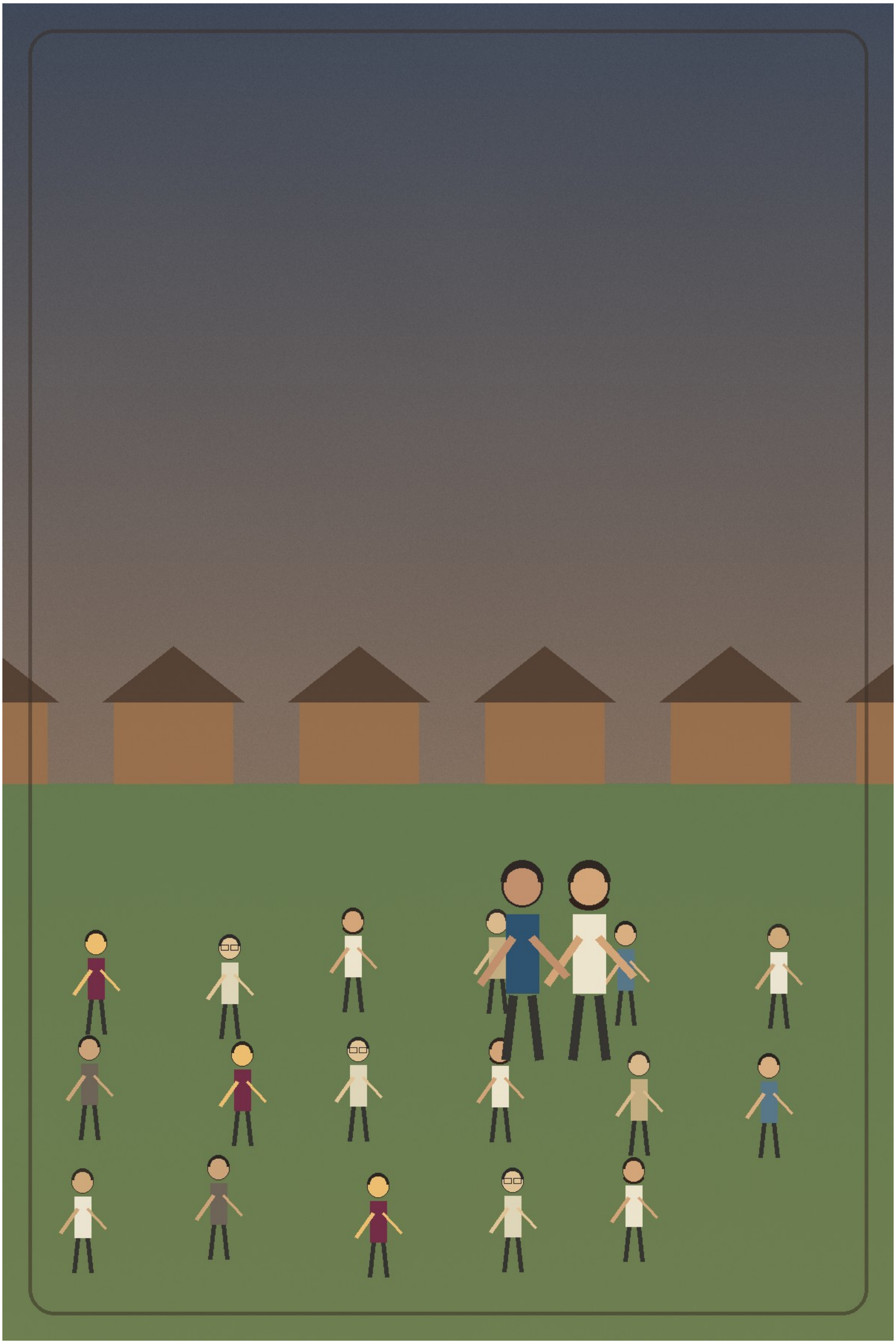

২০. ফুলমতি

ফুলমতি দে এলেন আশ্বিনের প্রথম সপ্তাহে। দুপুরের বাস থেকে নেমে কাউকে পথ জিজ্ঞেস করলেন না। সোজা বাজারপাড়া পেরিয়ে হাটতলায় এসে সুধীরের দোকানের সামনে দাঁড়ালেন। গাঢ় নীল সুতির শাড়ি, কাঁধে কাপড়ের ব্যাগ, হাতে লাল ফাইল। দীর্ঘ যাত্রার ধুলো মুখে, কিন্তু ভঙ্গিতে ক্লান্তির চেয়ে সিদ্ধান্ত বেশি।

“কুসুম সামন্ত কে?” তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

সুধীর বলল, “ডেকে দিচ্ছি। চা?”

“জল।”

জল খেয়ে তিনি বেঞ্চে বসলেন। ভোলা দা কাছে এসে বললেন, “আপনি কি নন্দলালবাবুর আত্মীয়?”

“না।”

“গবেষক?”

“না।”

“গুপ্তধনের?”

“না।”

ভোলা দা প্রথমবার তিন প্রশ্নে তিনটি এক শব্দের উত্তর পেয়ে চুপ করলেন।

কুসুম এল চন্দনাকে নিয়ে। ফুলমতি চিঠিটি বার করলেন। “তুমি লিখেছিলে?”

“হ্যাঁ।”

“নৃপেন দে আমার বাবা। তোমাদের কাগজের একটি পৃষ্ঠা আমার কাছে আছে।”

হাটতলার বাতাস বদলে গেল। যারা দূরে ছিল, কাছে এল। ফুলমতি ফাইল বুকে টেনে বললেন, “এখানে খুলব না। আগে যাদের থাকা দরকার, তাদের ডাকো।”

স্কুলের ঘরে জগন্নাথ, নন্দলাল, পঞ্চানন, কুসুম, চন্দনা ও হরেন বসেছিল। হরিহরকে খবর পাঠানো হলো। তিনি আসতে দেরি করলেন। ফুলমতি অপেক্ষা করলেন, কিন্তু অস্থির হলেন না।

হরিহর দরজায় দাঁড়াতেই তাঁর মুখের রং বদলে গেল। “তুমি?”

ফুলমতি বললেন, “আমার নাম মনে আছে, দেখছি।”

“এত বছর পরে কেন?”

“আমাকে চিঠি এসেছে। আর তোমাদের গ্রাম এখনও আমার বাবার কাগজ ব্যবহার করে নিজের ইতিহাস লিখছে।”

হরিহর বসেননি। “ব্যক্তিগত কথা এখানে নয়।”

“ব্যক্তিগত কথাকে তুমি এত বছর বাইরে অস্বীকার করেছ। এখন কোথায় বলব, তা আমি ঠিক করব।”

কেউ কথা বলল না।

ফুলমতি ফাইল খুলে প্রথমে একটি ছবি রাখলেন। তরুণ হরিহর, পাশে তরুণী ফুলমতি। সাধারণ স্টুডিও ছবি, দুজনের গলায় ফুলের মালা নেই। দ্বিতীয় কাগজ একটি হাতে লেখা ঘোষণা। দুই সাক্ষীর সামনে পারস্পরিক বিবাহস্বীকৃতির কথা, স্থানীয় প্রথায় অনুষ্ঠান, কিন্তু সরকারি নিবন্ধন হয়নি। তৃতীয় কাগজ হরিহরের চিঠি: “বাড়ির লোক মানছে না, কিছুদিন অপেক্ষা করো।” পরে আরেকটি: “এখন ফিরলে ঝামেলা হবে।” তারপর নীরবতা।

হরেনের চোখ হরিহরের দিকে। কাকা তার কাছে পরিবার, অথচ এই নারীও সেই পরিবারের অস্বীকৃত অংশ।

হরিহর বললেন, “আমি তখন বাইশ। পরিবার আমাকে ফিরিয়ে আনে। তোমার বাবাও শহর ছেড়ে যায়।”

ফুলমতি বললেন, “আমার বাবা আমাকে নিয়ে যায় কারণ তোমাদের বাড়ির লোক বলেছিল, আমি সেলাইকারের মেয়ে, এই বাড়িতে নাম হবে না। তুমি চিঠি লিখেছিলে অপেক্ষা করতে। তারপর আর লিখোনি।”

“আমি দুর্বল ছিলাম।”

“দুর্বলতা তোমার। তার শাস্তি আমার পরিচয় কেন পেল?”

হরিহর উত্তর দিতে পারলেন না।

ফুলমতি বললেন, তিনি হরিহরের বাড়িতে থাকতে আসেননি, বিয়ে ভাঙাতে আসেননি, টাকা চাইতেও নয়। তিনি চান, হরিহর লিখিতভাবে সম্পর্ক অস্বীকার করবেন না এবং তাঁর বাবার কাছে রাখা নথির পৃষ্ঠা গ্রামের সামনে পড়া হবে। তবে পৃষ্ঠাটি তিনি এখনই দেবেন না। প্রথমে নিরাপদ কপি, সাক্ষী এবং কীভাবে ব্যবহার হবে তার লিখিত সিদ্ধান্ত চাই।

নন্দলাল সম্মতি জানালেন। “মূল কাগজ আপনার। আমরা উচ্চ মানের ছবি ও প্রত্যয়িত প্রতিলিপি তৈরি করতে পারি।”

ফুলমতি তাঁকে দেখলেন। “আমার বাবার কাগজ নিয়ে বহু লোক আগ্রহ দেখিয়েছে। কেউ আমার বাবার নাম জানতে চায়নি।”

নন্দলাল মাথা নত করলেন। “এইবার নথিতে উৎসের নাম থাকবে।”

চন্দনা ফুলমতির পাশে বসে বললেন, “আপনি আমার বাড়িতে থাকবেন। মোড়লবাড়িতে নয়, যদি নিজে না চান।”

ফুলমতি তাঁর দিকে তাকিয়ে প্রথমবার সামান্য হাসলেন। “আপনার নাম?”

“চন্দনা।”

“চিঠির লেখায় আপনার বাবার নাম আছে।”

দুজন নারীর মধ্যে এমন একটি বোঝাপড়া তৈরি হলো, যা কোনো সভা অনুমোদন করেনি। একজন নিজের সম্পর্কের শর্ত স্থির করছেন, অন্যজন বহু বছরের অস্বীকৃত সম্পর্কের নাম ফেরত চাইছেন।

হরিহর বেরিয়ে যাওয়ার আগে বললেন, “আমি পালাব না।”

ফুলমতি উত্তর দিলেন, “এত বছর পরে দাঁড়িয়ে থাকাই প্রথম কাজ।”

সন্ধ্যায় হাটতলায় গুজব তুঙ্গে। কেউ বলল মোড়লের প্রথম স্ত্রী ফিরে এসেছে, কেউ বলল জমির মালিক, কেউ বলল নন্দলালের বোন। সুধীর দোকানের সামনে লিখে দিল: “ফুলমতি দে নিজে কথা না বলা পর্যন্ত কোনো সংবাদ নিশ্চিত নয়।” নিচে ভোলা দা ছোট করে যোগ করলেন, “তবে আলোচনা বন্ধ নয়।”

রাতে চন্দনার বাড়িতে ফুলমতি হারানো পৃষ্ঠা খুললেন। কুসুম, চন্দনা ও নন্দলাল সাক্ষী। পাতায় পরিষ্কার লেখা, শৈলবালা পাল নিজের দুই কাঁকন এবং পাঁচ পাড়ার নারীদের সংগৃহীত ধান বিক্রির টাকা জলপথের জমি ক্রয়ে দেন। নৃপেন দে পরে নকল সংরক্ষণ করেন। শেষে শর্ত: “এই পথ বন্ধ করিলে নিম্ন পাড়ার ক্ষতি হইবে। কোনো মোড়ল, জমিদার বা উত্তরাধিকারী একক অধিকারে লইতে পারিবে না।”

আরও একটি লাইন ছিল, যা বর্তমান সংকটকে সরাসরি ছুঁল: “আশ্বিনের পূর্ণ জলে দক্ষিণ মুখ না খুলিলে বাঁধ ভাঙিবে।”

কুসুমের হাত ঠান্ডা হয়ে গেল। পূর্ণিমা আর দশ দিন। ব্লক অফিসের পরিদর্শক এখনও আসেননি।

ফুলমতি কাগজ ভাঁজ করতে করতে বললেন, “আমার বাবা বলত, মানুষ কাগজ লুকোয় কারণ জলকে লুকানো যায় না।”

বাইরে দূরে মেঘ গর্জাল। বর্ষা শেষ হওয়ার কথা, কিন্তু আকাশ অন্য হিসাব করছে।

* * *

জল থামিয়ে রাখা যায় কিছুদিন, দায় নয়।

২১. স্বীকৃতির ছবি

ফুলমতির আগমনের পর প্রথম তিন দিন হরিহর হাটতলায় গেলেন না। তাঁর অনুপস্থিতিতে হাটতলার আলোচনা আরও বেড়ে গেল। যে মানুষ সাধারণত অন্যের বিবাদে শেষ কথা বলেন, তাঁর নিজের জীবনের অসমাপ্ত বাক্য এখন পাঁচ পাড়ার মুখে ঘুরছে।

কেউ ফুলমতিকে সাহসী বলল, কেউ বলল এত বছর পরে এসে কী লাভ, কেউ বলল সম্পত্তির দাবি আসবে। ফুলমতি কাউকে উত্তর দিলেন না। তিনি চন্দনার সঙ্গে বসে মশলার প্যাকেট ভরলেন, কুসুমের মাকে ওষুধের সময় মনে করালেন এবং বিকেলে নিজের ফাইল গুছিয়ে রাখলেন। তাঁর আচরণে অতিথির সংকোচ নেই, আবার ঘর দখলের তাড়াও নেই।

চতুর্থ দিন হরিহর নিজে চন্দনার বাড়িতে এলেন। সঙ্গে হরেন। তিনি উঠোনে দাঁড়িয়ে বললেন, “কথা বলতে চাই।”

ফুলমতি বললেন, “সবাই থাকবে।”

“ব্যক্তিগত কথা।”

“আমার ব্যক্তিগত জীবনকে তুমি জনসমক্ষে অস্বীকার করেছ। এবার সাক্ষী থাকবে।”

চন্দনা, কুসুম, হরেন ও বিনাপিসি বসে রইলেন। বিনাপিসি নিজেই এসেছেন। তাঁকে দেখে হরিহর বললেন, “পিসি, তুমি?”

“আমি তখনও ছিলাম,” তিনি উত্তর দিলেন।

হরিহর মাথা নিচু করলেন।

ফুলমতি ছবি ও চিঠিগুলো সামনে রাখলেন। “আমি কোনো নতুন বিয়ে দাবি করছি না। যা হয়েছিল, তা হয়েছিল। তুমি লিখে দেবে, আমাদের সম্পর্ক ছিল, পরিবার বাধা

দিয়েছিল, আর তুমি পরে যোগাযোগ বন্ধ করেছিলে। আমার নামে মিথ্যে অপবাদ ছিল না।"

হরিহর বললেন, "আমি লিখব।"

"নিজের ভাষায়। আইনজীবীর ভাষায় নয়।"

"লিখব।"

"আর আমার বাবার কাগজ গ্রামের নথিতে তাঁর নামসহ যাবে।"

"হবে।"

বিনাপিসি বললেন, "যা এত সহজে বলতে পারছিস, এত বছর লাগল কেন?"

হরিহর তাঁর দিকে তাকালেন। "আপনারা কেউ আমাকে বাধ্য করেননি।"

বিনাপিসির চোখে কষ্ট। "আমরা ঘরের মান বাঁচিয়েছি। মান বাঁচাতে গিয়ে মানুষকে মুছে দিয়েছি।"

ফুলমতি বললেন, "আপনিও জানতেন?"

"জানতাম। প্রতিবাদ করিনি। এখন বয়স হয়েছে বলে সত্যি বললে দায় কমে না।"

হরেন প্রথমবার বিনাপিসির এই স্বীকারোক্তি শুনল। তার মনে হলো, পরিবার কোনো একটি গোপন বাক্স নয়, যেখানে দোষী আর নির্দোষ আলাদা থাকে। এটি স্তরে স্তরে রাখা নীরবতা।

হরিহর কাগজে লিখলেন। হাতের লেখা কাঁপা নয়, কিন্তু প্রতিটি শব্দের মধ্যে বিরতি। শেষে সই করে ফুলমতির দিকে দিলেন। তিনি পড়ে বললেন, "একটি লাইন যোগ করো। আমি কোনো অর্থ বা সম্পত্তির দাবি নিয়ে আসিনি, কিন্তু আমার প্রাপ্য সামাজিক পরিচয় অস্বীকার করা যাবে না।"

হরিহর যোগ করলেন।

“আমি মোড়লবাড়িতে থাকব না,” ফুলমতি বললেন। “আমার কাজ শহরে। এখানে কাগজের কাজ শেষ করব, তারপর ফিরে যাব। সম্পর্কের স্বীকৃতি মানে পুরনো সংসার অভিনয় নয়।”

হরিহরের মুখে সামান্য বিস্ময়। হয়তো তাঁর মনে ছিল, স্বীকৃতি দিলে ফুলমতি বাড়িতে আসবেন, আরেক নতুন সামাজিক ঝড় উঠবে। নারী নিজের শর্তে চলে গেলে পুরুষের অনুশোচনাও কখনো কখনো ব্যবহারের সুযোগ হারায়।

হরেন বলল, “আমি আপনাকে কী বলে ডাকব?”

ফুলমতি তাকালেন। “আমার নাম ধরে ডাকতে পারো। সম্পর্কের নাম পরে ঠিক করো।”

“আমি জানতাম না।”

“তুমি না জানার দায় তোমার নয়। জানার পরে কী করো, সেটা তোমার।”

বিনাপিসি তখন কুসুমকে বললেন, “প্রথম চিঠিটা আমি লিখেছি।”

ঘরের সবাই তাঁর দিকে ফিরল।

হরিহর দাঁড়িয়ে পড়লেন। “আপনি?”

“হ্যাঁ। বহুবার বলেছি খালের মুখ খুলতে। তুই বলেছিস সময় আছে। মহিমের সঙ্গে কথা থামাতে বলেছি। শুনিসনি। পুরনো খাতার একটি পাতা নিয়ে লিখেছি, যাতে ভয় পেলেও নড়িস।”

কুসুম জিজ্ঞেস করল, “বটতলায় হিসাব মেলাও কেন?”

“বাক্সের কথা জানতাম। আমার বাবা দেখিয়েছিল। পরে জায়গা ভুলে গিয়েছিলাম। শুধু পশ্চিম শিকড় মনে ছিল। কাগজের উল্টো পিঠে পুরনো নকশা ছিল।”

“দরজায় কাঁঠালের কাঁটা?”

“হাতে পিন ছিল না। কাঁটা পেয়েছি।”

“গোলাপী?”

“আমার পেছনে এসেছিল। খালের কাদা মেখে ফেরে।”

হরেন বলল, “রাতে খালের কাছে যে গলা শুনেছিলাম?”

বিনাপিসি মাথা নাড়লেন। “আমি নই। ওই রাতে বাড়ি থেকে বেরোইনি।”

“আধুনিক কাগজ বাক্সে?” নন্দলাল, যিনি পরে এসে কথার শেষ অংশ শুনেছিলেন, জিজ্ঞেস করলেন।

“সেটাও আমি নই।”

প্রথম রহস্যের বড় অংশ সমাধান হলো, কিন্তু সব নয়। নন্দলালের চিঠি কে পাঠিয়েছিল, বাক্সে নতুন বার্তা কে ঢুকিয়েছিল, খালের রাতে “হিসাব মেলাও” কে বলেছিল, এখনও অজানা। বিনাপিসি স্বীকার করলেন, চিঠি লিখে তিনি ভুলও করেছেন। ভাষা এত ভয়াবহ হওয়ায় মানুষ আতঙ্কিত হয়েছে, মাখন সুযোগ পেয়েছে।

জগন্নাথ বললেন, “সতর্কবার্তা সত্যি হলেও পদ্ধতি বিপজ্জনক।”

বিনাপিসি বললেন, “সোজা কথা শুনলে চিঠি লাগত না।”

হরিহর উত্তর দিলেন, “আমি শুনিনি।”

এই স্বীকারোক্তি জনতার সামনে নয়, ছোট ঘরে। তবু কুসুম জানত, তার ওজন কম নয়।

ফুলমতি হারানো পৃষ্ঠার কপি করার অনুমতি দিলেন। নন্দলাল প্রতিটি ছবি দুই জায়গায় রাখলেন, স্কুলের তালাবদ্ধ আলমারি এবং জেলা নথিশালায় পাঠানোর খাম। উৎস হিসেবে লেখা হলো: “নৃপেন দে সংরক্ষিত পারিবারিক কপি, ফুলমতি দে কর্তৃক প্রদত্ত।”

ছবির পাঁচ নারীকে চিহ্নিত করার কাজ শুরু হলো। জহুরা তাঁর শাশুড়ির বর্ণনা থেকে একজনকে চিনতে পারলেন। চন্দনা বললেন, ডানদিকে সম্ভবত শৈলবালা। নন্দলালের পারিবারিক ছবির সঙ্গে মুখ মিলল।

হরিহর ছবিটির দিকে দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে বললেন, “আমাদের বাড়িতে এই ছবি ছিল না।”

বিনাপিসি বললেন, “যে ছবি মান নষ্ট করে, সে ছবি ঘরে থাকে না।”

ফুলমতি শান্ত গলায় বললেন, “মান নষ্ট করে ছবি নয়। ছবির আগে যা করা হয়।”

বাইরে মেঘ আবার জমছিল। রেডিওতে নিম্নচাপের খবর। আশ্বিনে এমন ভারী বৃষ্টি অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু এইবার পুরনো খালের মুখ বন্ধ। কাগজের ইতিহাস এবং আকাশের বর্তমান একই দিকে এগোচ্ছিল।

* * *

পূর্ণিমার ছয় দিন আগে বৃষ্টি শুরু হলো। প্রথম দিন ধীর, দ্বিতীয় দিন অবিরাম, তৃতীয় দিন বাতাসসহ। পটলপাড়ার ধান মাথা নুয়ে গেল। কলাবাগানের উঠোনে জল। বাজারপাড়ার পাকা রাস্তা দিয়ে এখনও বাস চলছে, কিন্তু খালের দিকে মাটির পথ নরম হয়ে গেছে।

ব্লক অফিসের পরিদর্শক আসেননি। ফোনে বলা হলো, অন্যত্র বন্যার কাজ চলছে। আবেদন নথিভুক্ত, সুযোগমতো দল যাবে। "সুযোগমতো" শব্দটি শুনে জহুরা বললেন, "জলও সুযোগমতো আসবে না।"

কুসুম ও হরেন প্রতিদিন খালের বাঁধের ছবি তুলল। ছোট ফাটল চওড়া হচ্ছে, কিন্তু মূল জলমুখ মাটি ও বাঁশে বন্ধ। নন্দলাল মানচিত্রে দেখালেন, যদি উজানের বিল ভরে যায়, চাপ দুই দিকে যাবে। পুরনো ইটের নালা এত জল নিতে পারবে না। দুর্বল জায়গা ভাঙলে স্রোত সরাসরি কলাবাগানের ঘরে।

হরিহর বললেন, "নিজেরা বাঁধ কাটলে বিপদ আরও বাড়তে পারে।"

"খোলার পরিকল্পনা দরকার," জগন্নাথ বললেন। "কোথায় কতটা কাটব, মানুষ সরাব, আলো, দড়ি, সব।"

মহিম গুদামের জমিতে বাঁশের বেড়া তুলতে লোক পাঠিয়েছিল। কুসুম বাধা দিলে তারা বলল, কাজের নির্দেশ আগের। মহিম এসে বলল, "বাঁধ কেটে আমার জমি ডোবালে মামলা করব।"

জহুরা বললেন, "তোমার কাগজের জমি বাঁচাতে আমাদের ঘর ডুববে?"

মহিম বলল, "প্রকৌশলী সিদ্ধান্ত নেবে, গুজব নয়।"

হরেন কুসুমের দিকে তাকাল। পঞ্চগ্রামে কোনো প্রকৌশলী নেই। যে সরকারি পরিদর্শকের জন্য তারা অপেক্ষা করছে, তিনি এখনও আসেননি।

কুসুম বলল, “ঠিক। তাই পরিদর্শনের আবেদন করেছি। ততদিন ঝুঁকির জায়গায় নতুন কাজ বন্ধ রাখুন।”

মহিম শুনল না। হরিহর এবার প্রথমবার তার সামনে বললেন, “কাজ বন্ধ থাকবে।”

মহিম অবাক। “আপনি তো সম্মতি দিয়েছিলেন।”

“রাস্তার। খাল ভরাটের নয়।”

“এখন কথার মানে বদলাচ্ছেন।”

হরিহর বললেন, “লিখিত অনুমতি দেখাও।”

মহিমের কাছে ছিল না। সে চলে গেল, কিন্তু লোকজনকে পুরো সরাল না।

চতুর্থ রাতে গোলাপী খোঁয়াড় থেকে বেরিয়ে আবার খালের দিকে গেল। দাসু ধরতে পারেনি। সকালে সে ফিরে এল না। হরিহর উৎকণ্ঠায় নিজেই লাঠি নিয়ে বেরোলেন। কুসুম, হরেন ও গোপালও সঙ্গে।

খালের বাঁধের কাছে গোলাপীর ডাক নিচ থেকে আসছিল। নতুন মাটির একাংশ বসে ছোট গহ্বর হয়েছে। গোলাপী গর্তের কিনারে আটকে, পা কাদায়। তাকে তুলতে গিয়ে গোপাল দেখল মাটির নিচ দিয়ে জোরে জল ঢুকছে। বাঁশের কাঠামো ভেতর থেকে ফাঁপা হয়ে গেছে। ওপরটা শক্ত দেখালেও নিচে স্রোত কামড়াচ্ছে।

“এটা ভাঙবে,” গোপাল বলল।

হরিহর নিজে নেমে হাঁসটিকে তুললেন। কাদা কোমর পর্যন্ত। উঠে এসে দীর্ঘ শ্বাস নিয়ে বললেন, “আজই সভা।”

হাটতলায় দুপুরে জরুরি সভা বসার আগেই মাখনের নতুন খবর ছড়াল। সে বলেছে, পূর্ণিমার রাতে খাল কাটলে “পাঁচদ্বারের অভিশাপ” মুক্ত হবে এবং গ্রাম ধ্বংস হবে। যারা তার আসরের টাকা দিয়েছে, তারা বাঁধের কাছে যেতে ভয় পেল। যারা দেয়নি, তাদের কেউ কেউ ভাবল, যদি সত্যিই কিছু হয়।

পঞ্চানন রেগে বাড়ি বাড়ি গেলেন। “খাল মানুষ কেটেছে, মানুষ পরিষ্কার করবে। অভিশাপের গল্প যারা টাকা নিয়েছে, তাদের সুবিধা।”

শিবু স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে ওআরএস, ব্যান্ডেজ, প্রাথমিক ওষুধের তালিকা আনল। সে বলল, “বন্যায় সাপের কামড়, কাটা, পানিবাহিত রোগ হতে পারে। আমি একা চিকিৎসা করব না। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে খবর দিয়েছি।”

জগন্নাথ স্কুলকে আশ্রয়কেন্দ্র করার প্রস্তুতি নিলেন। বেঞ্চ সরানো, পানির কল পরিষ্কার, শুকনো খাবার। ছাত্রদের দিয়ে গুজব নয়, নিরাপত্তার বার্তা বাড়িতে পাঠালেন।

কুসুম পাঁচ পাড়ার নারীদের নিয়ে তালিকা করল, কোন ঘরে বৃদ্ধ, শিশু, অসুস্থ মানুষ। চন্দনা ও ফুলমতি শুকনো মুড়ি, চিড়ে, গুড় প্যাক করলেন। রামলোচন রান্নার দায়িত্ব নিতে চাইলেন। চন্দনা বললেন, “এবার পরীক্ষার প্রশ্ন কঠিন।”

“আগুন ঠিক রাখব,” রামলোচন বললেন।

বৃষ্টির মধ্যে হাসি ক্ষণিকের, কিন্তু দরকারি।

সন্ধ্যায় বাঁধের ফাটল আরও বড় হলো। জল এখনও পাতলা ধারায়, কিন্তু মাটির নিচে গর্জন। নন্দলাল মানচিত্রে একটি পুরনো পাথরের জলদ্বারের চিহ্ন দেখালেন। যদি সেটি পাওয়া যায় এবং নিয়ন্ত্রিতভাবে খোলা যায়, চাপ কমবে। স্থান নির্ধারণে পঞ্চাননের ছড়া সহায়তা করতে পারে।

হরিহর বললেন, “আগে সভায় সিদ্ধান্ত।”

কুসুম আকাশের দিকে তাকাল। সভার সময় আছে কি না, নিশ্চিত নয়। পূর্ণিমা এখনও দুই রাত দূরে, কিন্তু নদী ক্যালেন্ডার পড়ে না।

রাতে মোড়লবাড়ির পুরনো গুদামের এক দেয়াল ভিজে ভেঙে পড়ল। ধুলোর মধ্যে কাঠের একটি ফলক পাওয়া গেল। তাতে খোদাই করা পাঁচটি কড়ি এবং নিচে তীরচিহ্ন, দক্ষিণ পশ্চিমে। বিনাপিসি বললেন, “জলদ্বারের দিক।”

হরিহর ফলক হাতে নিয়ে কুসুমকে দিলেন। “কাল সভায় তুমি মানচিত্র খুলবে।”

এটি অনুরোধ নয়, দায়িত্ব ভাগ করা। কুসুম বুঝল, হরিহরের ভিতরের বাঁধও কোথাও ফাটছে।

* * *

২৩. পাঁচ পাড়ার সভা

পঞ্চায়েত ঘরে এত মানুষ আগে কেবল ভোটের গণনার সময় হয়েছিল। বাইরে বৃষ্টি, ভেতরে ভেজা ছাতা, কাদা, গরম নিঃশ্বাস এবং প্রত্যেকের আলাদা জরুরি মত। টেবিলের ওপর পুরনো মানচিত্র, আধুনিক খতিয়ান, ফুলমতির পৃষ্ঠা, হরেনের ছবি, ব্লক অফিসের আবেদন এবং পাঁচ কড়ি।

হরিহর সভা শুরু করে বললেন, “আজ সিদ্ধান্ত হবে। কথা সংক্ষিপ্ত রাখবেন।”

প্রথম বক্তা ভোলা দা। তিনি পনেরো মিনিট ধরে বললেন, কীভাবে তাঁর দাদার সময়ে নৌকা হাটতলায় আসত। হরিহর তিনবার সংক্ষিপ্ত হতে বললেন। ভোলা দা প্রতিবার বললেন, “শেষ করছি”, তারপর নতুন শুরু করলেন।

দ্বিতীয় বক্তা মহিম। সে বলল, গুদাম উন্নয়ন, কর্মসংস্থান এবং বাজারের ভবিষ্যৎ। খাল ভাঙার ঝুঁকিকে অতিরঞ্জিত বলা হচ্ছে। তার আবেদনের জমি বর্তমান নথি এ বৈধ। পুরনো নথি আদালতে যাচাই না হওয়া পর্যন্ত কোনো কাজ করা যাবে না।

জহুরা বললেন, “জল আদালতের তারিখ নেবে?”

মহিম বলল, “আবেগে সিদ্ধান্ত নয়।”

কুসুম উঠে মানচিত্র মেলে ধরল। “এটি আবেগ নয়। পুরনো নালা এখানে। নতুন বাঁধ এখানে। ফাটল এখানে। গত চার দিনে জলস্তর এতটা বেড়েছে।” হরেনের ছবিগুলো তারিখ অনুযায়ী সাজানো। “বাঁধের নিচে ফাঁপা গহ্বর। নিয়ন্ত্রিত জলদ্বার না খুললে অনিয়ন্ত্রিত ভাঙন হবে।”

মহিম বলল, “তুমি প্রকৌশলী নও।”

জগন্নাথ বললেন, “সে দাবি করেনি। পর্যবেক্ষণ দেখাচ্ছে। সরকারি দল না আসা পর্যন্ত স্থানীয় ঝুঁকি কমানোর সিদ্ধান্ত নিতেই হবে।”

মোড়লপাড়ার কিছু মানুষ বলল, জলদ্বার খুললে তাদের পুকুরের জল নেমে যাবে। পটলপাড়ার মানুষ বলল, না খুললে ধান ডুববে। বাজারপাড়া জানতে চাইল, রাস্তা কাটা হবে কি না। মোল্লাপাড়া বলল, সাঁকো দুর্বল। আলোচনা পাঁচ দিকে ছড়িয়ে গেল।

শিবু দাঁড়িয়ে বলল, "বিপদ হলে প্রথমে প্রাণ বাঁচাতে হবে। সম্পত্তির হিসাব পরে।"

কেউ পেছন থেকে বলল, "এখন ডাক্তারি নয়।"

শিবু উত্তর দিল, "ঠিক। আমি ডাক্তার নই। কিন্তু শ্বাস বন্ধ হলে জমির কাগজ পড়া যায় না।"

পঞ্চানন পুরনো ছড়াটি বললেন এবং মানচিত্রে পাথরের জলদ্বারের সম্ভাব্য জায়গা দেখালেন। জগন্নাথ প্রথমে আপত্তি করলেন, "ছড়া মাপ নয়।" তারপর নিজেই গতদিনের মাপের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলেন। দূরত্ব কাছাকাছি। তিনি বললেন, "এটি সম্ভাব্য নির্দেশ। পরীক্ষা করা যায়।"

মাখন সভার পেছনে দাঁড়িয়ে বলল, "যারা পাঁচদ্বার ভাঙবে, তাদের দায় আমি নেব না।"

ফুলমতি শান্তভাবে বললেন, "আপনাকে দায় নিতে কেউ বলেনি। টাকা ফেরত দিতে বলেছে।"

ভিড়ে হাসি উঠল, কিন্তু ফুলমতির মুখে হাসি নেই। মাখন সরে গেল।

নন্দলাল হারানো পৃষ্ঠা পড়লেন। শৈলবালার অবদান, সাধারণ জলপথ, পূর্ণ জলে দক্ষিণ মুখ খোলার নির্দেশ। তারপর চন্দ্রেশের আপত্তি ও বালিশে পাওয়া হিসাব দেখালেন। নথি বদলের ইতিহাস স্পষ্ট, যদিও আইনগত নিষ্পত্তি বাকি।

হরিহর উঠে দাঁড়ালেন। ঘর নীরব।

"আমার বাবা দক্ষিণের জমি নিজের নামে তুলেছিলেন," তিনি বললেন। "আমি জানতাম নথি নিয়ে প্রশ্ন আছে। মহিমের গুদামের কথায় আমি সম্মতি দিয়েছিলাম, কারণ

বাড়ির ঋণ আছে এবং গ্রামের বাজার বাড়বে ভেবেছিলাম। খালের ঝুঁকি এতটা জানতাম না, কিন্তু জানতে চাইনি। এটাও দায়।”

মহিম চেঁচিয়ে উঠল, “আপনি এখন সব আমার ঘাড়ে দিচ্ছেন।”

হরিহর বললেন, “তুমি খাল বন্ধ করে কাজ করেছ, মাখনের ভয় ব্যবহার করেছ। আমার নীরবতা তোমাকে সুযোগ দিয়েছে। দুজনের দায় আলাদা।”

এই প্রথম হরিহর জনতার সামনে নিজের ভুল বললেন। তাঁর গোঁফ একই জায়গায়, কিন্তু কণ্ঠে ঘোষণার বদলে স্বীকারোক্তি।

সভায় সিদ্ধান্ত হলো:

প্রথমত, স্কুলে বৃদ্ধ, শিশু ও অসুস্থদের সরানো হবে।

দ্বিতীয়ত, পাঁচ পাড়া থেকে সমান সংখ্যক মানুষ নিয়ে জলদ্বার খোঁজার দল হবে।

তৃতীয়ত, নতুন মাটির বাঁধ পুরো কাটা নয়। পুরনো পাথরের জলদ্বার পাওয়া গেলে নিয়ন্ত্রিতভাবে খোলা হবে।

চতুর্থত, ব্লক অফিস ও থানায় লিখিত খবর পাঠানো হবে।

পঞ্চমত, মহিমের কাজ বন্ধ থাকবে।

মহিম সিদ্ধান্ত মানতে অস্বীকার করল। হরিহর বললেন, “গ্রামসভা ও ঝুঁকি নথিভুক্ত। তুমি বাধা দিলে পুলিশে অভিযোগ হবে।”

বাইরে হঠাৎ প্রচণ্ড বজ্রপাত। তার পরে কেউ দৌড়ে এসে জানাল, বাঁধের ফাটল দিয়ে জল এখন হাঁটু উচ্চতায় বেরোচ্ছে।

সভা আর আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হলো না। মানুষ ছাতা, লাঠি, কোদাল নিয়ে বেরিয়ে গেল। যাদের কয়েক মিনিট আগে মত আলাদা ছিল, তারা এখন একই সরু দরজায় ঠেলাঠেলি করছে।

কুসুম মানচিত্র ভাঁজ করতে গেলে হরিহর বললেন, “খোলা রাখো। পথ এখন ওটাই দেখাবে।”

* * *

পঞ্চায়েত ঘর থেকে পুরনো খালের দিকে যে দলটি বেরোল, তাকে মিছিল বলা যায়, আবার উদ্ধারদলও। কারও হাতে কোদাল, কারও ঝুড়ি, কারও লণ্ঠন, কারও দড়ি। হরেন ফোনের আলো জ্বালিয়েছে, কিন্তু বৃষ্টিতে পর্দা বারবার নিভছে। মোল্লাপাড়ার মদন ঢোল আনেনি। সে বাঁশের লম্বা খুঁটি এনেছে, জলের গভীরতা মাপবে।

কুসুম সামনে মানচিত্রের প্লাস্টিক মোড়া কপি ধরে। পাশে নন্দলাল ও পঞ্চানন। জগন্নাথ মানুষ গুনছেন। শিবু পিছনে প্রাথমিক সাহায্যের ব্যাগ নিয়ে। হরিহর নিজের বয়স ভুলে কোদাল কাঁধে। ফুলমতি ও চন্দনা স্কুলে আশ্রয়ের ব্যবস্থা দেখছেন, পরে খাবার নিয়ে আসবেন।

খালের কাছে পৌঁছে দেখা গেল নতুন বাঁধের মাঝখান বসে গেছে। গর্ত দিয়ে ঘোলা জল ফেনা তুলে বেরোচ্ছে। মাটির ওপর দাঁড়ানো বিপজ্জনক। সবাই দুই পাশে সরে গেল।

পঞ্চানন ছড়ার মাপ বললেন। বটগাছের দিক থেকে পাঁচ হাত, তারপর বাঁক, সাত হাত পরে পাথর। কিন্তু জল ও নতুন মাটিতে পুরনো রেখা দেখা যায় না। নন্দলাল কম্পাসে দিক নিলেন। হরেন পুরনো ফলকের তীরচিহ্ন মিলিয়ে দক্ষিণ পশ্চিমে গেল। বাঁশ ঢুকিয়ে এক জায়গায় শক্ত পাথর পেল।

গোপাল ও দুই কৃষক মাটি সরাল। নিচে পাথরের চৌকো ঢাকনা, মাঝখানে লোহার বলয়। জং ধরে আছে। চারপাশে জলচাপ। ভুলভাবে তুললে হঠাৎ স্রোত সবাইকে ফেলতে পারে।

জগন্নাথ বললেন, “দড়ি বাঁধো। সবাই পাশে।”

হরেন বলয় পরিষ্কার করল। গোপাল দড়ি গিঁট দিল। পঞ্চানন তিন পাক, এক উল্টো পাক দেখে বললেন, “মাখনের গিঁট নয়, এবার কাজের।”

কেউ সামান্য হাসল। ভয় পুরো সরল না, কিন্তু হাতের শক্তি ফিরল।

ঠিক তখন মাখন কয়েকজনকে নিয়ে এসে চিৎকার করল, "এটা খুললে সর্বনাশ হবে। পুরনো সিল ভাঙা যাবে না।"

জহুরা বললেন, "সিল তোমার দোকানের নয়।"

মাখনের সঙ্গে মহিমও। সে বলল, "আমার জমিতে ঢুকেছেন। কাজ বন্ধ করুন।"

হরিহর তাঁর সামনে দাঁড়ালেন। "এই পথ সাধারণের। নথি আছে। আর এখন প্রাণের ঝুঁকি।"

মহিম বলল, "আপনি কাল পর্যন্ত অন্য কথা বলেছিলেন।"

"কাল ভুল বলেছি।"

সামনে এত মানুষের মধ্যে ভুল স্বীকার করার শক্তি মহিমের ছিল না। সে রাগে বলল, "ক্ষতি হলে দায় আপনার।"

হরিহর বললেন, "লিখে নাও।"

জলের শব্দ বাড়ছিল। দূরে কলাবাগানের দিকে চিৎকার, একটি কাঁচা ঘরের দেওয়াল বসেছে। সময় নেই।

দড়ি পাথরের বলয়ে বাঁধা হলো। দশজন টানল। নড়ল না। আরও মানুষ এল। মাটিতে পা পিছলাচ্ছে। হরেন বলল, "একসঙ্গে নয়। তিন গুনে।"

ভোলা দা, যিনি বয়সের কারণে পেছনে থাকার কথা, তিনিও দড়ি ধরলেন। বললেন, "আমার দাদার নৌকা এই পথেই চলত।"

গোপাল বলল, "দাদা ছিল কি না পরে দেখব। এখন টানুন।"

এক, দুই, তিন। পাথর কেঁপে উঠল। ফাঁক দিয়ে তীব্র জল বেরিয়ে হরেনকে ফেলে দিল। কুসুম তার হাত ধরল। শিবু দৌড়ে এল, কিন্তু হরেন উঠে বলল, "আমি আছি।"

দ্বিতীয় টানে পাথর উঠল। নিচে সরু স্লুইস, কাঠ ও পলি দিয়ে আটকে। পুরনো কাঠের ওপর নতুন বাঁশ ঠেস দেওয়া। কেউ সাম্প্রতিক সময়ে ইচ্ছে করে আরও বন্ধ করেছে। বাঁশে মহিমের আড়তের নীল রং।

মহিম বলল, "আমার লোকের বাঁশ চুরি হতে পারে।"

কেউ উত্তর দিল না। প্রমাণ এখন জলের সামনে ছোট।

কোদাল দিয়ে পলি সরানো শুরু হলো। প্রথমে সরু স্রোত, তারপর গর্জন। সবাই দড়ি ধরে পাশে। জল পুরনো নালায় ঢুকে দক্ষিণের বিলের দিকে ছুটল। নতুন বাঁধের ওপর চাপ কমতে লাগল।

কিন্তু পশ্চিম পাশে আরেকটি মাটির অংশ ভেঙে গেল। হঠাৎ স্রোত গোপালকে টেনে নিল। হরিহর ঝাঁপিয়ে তার গামছা ধরলেন। হরেন ও জগন্নাথ হরিহরকে টানল। কয়েক সেকেন্ডে চারজন কাদায়, দড়িতে, জলে একসঙ্গে বাঁধা। গোপাল উঠে কাশতে কাশতে বলল, "আজ মাছের উদাহরণ দেব না।"

শিবু তার কপালের কাটা পরিষ্কার করল। "গভীর নয়। মাথা ঘুরলে বলবেন।"

"আপনি নিশ্চিত?"

শিবু বলল, "এইটুকুতে নিশ্চিত। বেশি হলে পাঠাব।"

জলদ্বার পুরো খোলার পরে স্রোত নালায় চলল। কলাবাগানের জল তৎক্ষণাৎ নামল না, কিন্তু বাড়া থামল। পটলপাড়ার মাঠে নতুন ঢেউ না গিয়ে পুরনো বিলের দিকে পথ পেল। মোল্লাপাড়ার সাঁকো টিকে গেল।

পূর্ণিমার চাঁদ মেঘের আড়ালে ছিল। মাঝরাতে একবার মেঘ সরে সাদা আলো পড়ল বটগাছ, ভেজা মানুষ আর খোলা জলপথে। কেউ মন্ত্র পড়ল না, কেউ বিজয় ঘোষণা করল না। সবাই ক্লান্ত হয়ে জলের শব্দ শুনল। বহু বছর পরে পথ ফিরে পেয়ে জল যেন কারও অনুমতি চাইছে না।

মাখন নিঃশব্দে চলে যেতে চাইলে ফুলমতি, যিনি খাবার নিয়ে পৌঁছেছিলেন, বললেন, “টাকার তালিকা ভুলবেন না।”

সুধীর ভেজা খাতা তুলে দেখাল। “সব নাম আছে।”

মাখন প্রথমবার কোনো বড় বাক্য বলল না।

ভোরের আগে স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে দল এল। ব্লক অফিসের কর্মীও। তারা বাঁধ, স্লুইস, নথির কপি ও ছবি নিল। এক কর্মী বলল, “আগে জানালে ভালো হতো।”

কুসুম ক্লান্ত চোখে তার দিকে তাকাল। হরেন উত্তর দিল, “তিনবার লিখেছি। তারিখ খাতায় আছে।”

সুধীরের ধারখাতা শুধু চায়ের নয়, আবেদন পাঠানোর তারিখও রেখেছিল। কর্মী আর কিছু বলল না।

গোলাপী কোথায় ছিল কেউ খেয়াল করেনি। সূর্য ওঠার সময় তাকে দেখা গেল খোলা নালার পাশে দাঁড়িয়ে, ডান পায়ের নীল ফিতা জলে ভাসছে। হরিহর তাকে কোলে নিলেন। এইবার সে ঠোকর দিল না।

* * *

২৫. বটতলার হিসাব

বিপদ কেটে যাওয়ার পর পঞ্চগ্রামের মানুষ প্রথমে ঘুমাল। তারপর ক্ষয়ক্ষতি গুনল। কলাবাগানের তিনটি কাঁচা দেওয়াল ভেঙেছে, পটলপাড়ার কিছু ধান নষ্ট, বাজারপাড়ার রাস্তার এক অংশ বসে গেছে। কিন্তু বড় বন্যা হয়নি, প্রাণহানি নেই। পুরনো জলদ্বার সময়মতো খুলে চাপ কমেছে।

ব্লক অফিস জরুরি পরিদর্শনের রিপোর্ট করল। নতুন মাটি ফেলা ও স্লুইস বন্ধ করার কাজ অনুমোদনহীন। মহিমের আবেদন স্থগিত। জমির নথি পুনরীক্ষণ হবে। থানায় মাখন ও মহিমের বিরুদ্ধে প্রতারণা, জনপথে বাধা এবং প্রমাণ নষ্টের অভিযোগ নথিভুক্ত হলো। গ্রামবাসীর কেউ মারধর করেনি, যা হরিহর বিশেষভাবে নিশ্চিত করেছিলেন।

তবু রহস্যের সব হিসাব মেলেনি। নন্দলালের চিঠি কে পাঠিয়েছিল, বাক্সে আধুনিক বার্তা কে ঢুকিয়েছিল, খালের রাতে হরেন যে কণ্ঠ শুনেছিল তা কার।

সুধীরের ধারখাতা থেকে একটি সূত্র পাওয়া গেল। তিন মাস আগে পুরনো কাগজের গাদা কিনেছিল মহিমের কর্মচারী রতন। তার সঙ্গে মাখনের কানাই ছিল। তারা পুঁটলি ও প্যাকিংয়ের জন্য কাগজ নেয়। সেই গাদায় চন্দ্রেশের কপি, ফুলমতির ঠিকানা এবং নন্দলালের জেলা নথিশালার একটি পুরনো পরিচয়পত্র থাকতে পারে।

কানাই জিজ্ঞাসাবাদে বলল, কাগজের মধ্যে পাঁচ বিন্দুর ছাপ ও “শৈলবালা” নাম দেখে সে মাখনকে দেখায়। মাখন বুঝতে না পেরে মহিমকে দেয়। মহিম নথি দেখে ভয় পায়, কারণ পুরনো খালের জমি নিয়ে তার আবেদন। তারা কিছু কাগজ পুড়িয়ে ফেলে, কিছু রেখে দেয়। মাখন বাক্সের জায়গা জানতে পঞ্চাননের ছড়া ও ভোলা দার গল্প ব্যবহার করে। রাতের অন্ধকারে তারা বটগাছের কাছে খোঁজে, কিন্তু বাক্স তুলতে পারে না। মানুষকে দূরে রাখতে আলো ও শব্দের যন্ত্র বসায়।

“বাক্সে কাগজ ঢুকিয়েছিলে?” কুসুম জিজ্ঞেস করল।

কানাই মাথা নাড়ল। “না। আমরা বাক্সের ফাঁক দেখেছিলাম, কিন্তু লিখিনি।”

মহিমও অস্বীকার করল। নন্দলালের চিঠির কথা সে জানত না বলে দাবি। তার কথার ওপর বিশ্বাস কম, কিন্তু হাতের লেখাও মেলেনি।

রতন বলল, একদিন পুরনো কাগজের মধ্যে নন্দলালের পরিচয়পত্র দেখে সে সুধীরের দোকানে রেখে দিয়েছিল। সুধীর মনে করতে পারল, পরিচয়পত্রটি বিনাপিসি নিয়েছিলেন।

সবাই আবার বিনাপিসির দিকে তাকাল। তিনি বললেন, “নন্দলালকে চিঠি আমি লিখিনি। নাম ঠিকানা পড়তে পারিনি, জগন্নাথকে দিতে চেয়েছিলাম। পরে পরিচয়পত্র হারায়।”

জগন্নাথ বললেন, “আমার কাছে আসেনি।”

চন্দনা মনে করলেন, ফুলমতিকে চিঠি পাঠানোর আগে এক অচেনা পোস্টকার্ড তাঁর উঠোনে পড়েছিল। হয়তো নন্দলালের। কে নিয়েছিল জানা নেই।

ভোলা দা দীর্ঘ সময় চুপ থেকে শেষে বললেন, “আমি একটি কথা বলিনি।”

সবাই তাকাল।

“প্রথম চিঠির দিন ভোরের আগে আমি মোড়লবাড়ির পথে এক নারীকে দেখেছিলাম। ধূসর শাল। ভেবেছিলাম বিনাপিসি। পরে বটগাছের কাছে আরেকজনকে দেখেছি, লম্বা, মাথায় কাপড়। সে আমাকে দেখে বলেছিল, ‘হিসাব মেলাতে দেরি কোরো না।’ আমি ভেবেছিলাম গল্পের সুযোগ। মুখ দেখিনি।”

“আগে বলেননি কেন?” জগন্নাথ জিজ্ঞেস করলেন।

“বললে সবাই ভাবত আমি বানাচ্ছি।”

সুধীর বলল, “এখন কী ভাববে?”

“এখন প্রমাণের সঙ্গে গল্প মেলেছে।”

ফুলমতি বললেন, তাঁর শহরে এক বৃদ্ধা ছিলেন, নাম সত্যবতী পাল, শৈলবালার নাতনি। নৃপেন দের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। কয়েক মাস আগে তিনি মারা যান। নন্দলালের গবেষণার কথা জানতেন। সম্ভবত তিনিই পরিচয়পত্র বা ঠিকানা পেয়ে চিঠি পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু পঞ্চগ্রামে এসে বাক্সে বার্তা ঢোকানো তাঁর পক্ষে কঠিন, তিনি অসুস্থ ছিলেন।

নন্দলাল বললেন, আমার চিঠির ডাকসিল জেলা শহরের। সত্যবতী পাঠাতে পারেন। হাতের লেখা তাঁর পুরনো পোস্টকার্ডের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা যাবে। পরে মিল পাওয়া গেল, পুরোপুরি নয়, তবে যথেষ্ট কাছাকাছি। সম্ভবত নন্দলালের চিঠি সত্যবতীর।

বাক্সের আধুনিক বার্তা আর রাতের কণ্ঠ অমীমাংসিত রইল। কানাই হয়তো সত্য গোপন করছে, মাখন হয়তো অন্য কাউকে ব্যবহার করেছে, আবার ভোলা দার স্মৃতি গল্পে বদলেছে। নন্দলাল বললেন, “সব ফাঁক জোর করে পূরণ করলে নথি নয়, উপন্যাস হয়।”

ভোলা দা বললেন, “উপন্যাসেরও সম্মান আছে।”

কুসুম হাসল। “তাই ফাঁকটুকু লিখে রাখব, বানিয়ে নয়।”

বটতলায় একটি প্রকাশ্য পাঠের আয়োজন হলো। লোহার বাক্সের তালিকা, পাঁচ কড়ি, মানচিত্র, ফুলমতির পৃষ্ঠা, বালিশের হিসাব, সব কপি টাঙানো। হরিহর নিজে বললেন, তাঁর পরিবারের নথি সুবিধামতো বদলেছে এবং তিনি নীরব থেকে ভুল করেছেন। মহিমের বিরুদ্ধে অভিযোগ চলবে, তবে তার পরিবারকে সামাজিকভাবে হেনস্থা করা হবে না। মাখনের ক্রেতাদের টাকা ফেরতের তালিকা সুধীর রাখবে।

ফুলমতি হরিহরের লিখিত স্বীকৃতি পড়লেন না। সেটি তাঁর ব্যক্তিগত কাগজ। জনতার সামনে শুধু বললেন, “আমার নাম অস্বীকার করা হবে না। এর বেশি আমার জীবন আপনাদের প্যাঁচালের বিষয় নয়।”

হাটতলা নীরব। তারপর জহুরা বললেন, “ঠিক কথা।”

শৈলবালার নাম প্রথমবার উচ্চস্বরে নথি থেকে পড়া হলো। পঞ্চানন ছড়াটি বললেন, নন্দলাল তার ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা দিলেন, জগন্নাথ বললেন কোন অংশ প্রমাণিত, কোন অংশ এখনও অনুমান। তিন ধরনের জ্ঞান একই টেবিলে বসেছিল।

শেষে হরিহর পাঁচটি কড়ি হাতে নিলেন। আগে হলে তিনি মোড়লবাড়িতে রাখার কথা বলতেন। আজ বললেন, “স্কুলের আলমারিতে থাকবে। পাঁচ পাড়ার কমিটির অনুমতি ছাড়া খোলা হবে না।”

কুসুম জিজ্ঞেস করল, “কমিটির সদস্য?”

“প্রতিটি পাড়া থেকে একজন নারী ও একজন পুরুষ। শিক্ষক, দোকানি, কৃষক, শ্রমিক, সবাই পালা করে।”

ভোলা দা বললেন, “গল্পকারের জায়গা?”

সুধীর বলল, “আপনি দর্শকসারি থেকে কথা বলবেন। থামানো যাবে না, কিন্তু সিদ্ধান্তও একা নেবেন না।”

বটগাছের পাতা থেকে তখনও বৃষ্টির জল ঝরছিল। গর্তটি মাটি দিয়ে বন্ধ করা হয়নি। পাশে ইট বসিয়ে ছোট ফলক লাগানোর সিদ্ধান্ত হলো, যাতে লেখা থাকবে এখানে পঞ্চগ্রামের সাধারণ জলপথের নথি পাওয়া গিয়েছিল।

নন্দলাল গর্তের দিকে তাকিয়ে বললেন, “গুপ্তধন পেলেন?”

গোপাল বলল, “তামার থালা এখনও রান্নায় লাগেনি।”

কুসুম বলল, “যা পেয়েছি, রান্নার চেয়ে বেশি ঝামেলা করেছে।”

ফুলমতি উত্তর দিলেন, “ভালো ইতিহাসের কাজই ঝামেলা করা।”

* * *

রহস্য মেটে, মানুষের কথা মেটে না। সেটিই কখনো বিপদ, কখনো আশ্রয়।

২৬. দলিলের পাঠ

পূর্ণিমার রাতের তিন সপ্তাহ পরে আকাশ পরিষ্কার হলো। ধানের ক্ষতি গোনা শেষ হয়নি, ভাঙা দেওয়ালে নতুন মাটি পড়ছে, পুরনো জলদ্বারের পাশে বাঁশের অস্থায়ী সাঁকো। তবু গ্রামের মুখে এক ধরনের স্বস্তি। বিপদ কেটে গেলে মানুষ প্রথমে ক্ষত মেরামত করে, তারপর ঘটনার অর্থ ঠিক করে। পঞ্চগ্রাম দ্বিতীয় কাজটি হাটতলায় করল।

বটগাছের নিচে লম্বা টেবিল। তার ওপর নথির কপি, পাঁচ কড়ি, মানচিত্র, ছবির প্রতিলিপি এবং প্রত্যেক নথির উৎস লেখা আলাদা কার্ড। নন্দলাল জোর দিয়েছিলেন, যেখানে নিশ্চিত প্রমাণ নেই সেখানে “সম্ভাব্য” লেখা হবে। জগন্নাথ প্রতিটি নামের বানান যাচাই করলেন। পঞ্চানন ছড়ার পুরনো শব্দ বুঝিয়ে দিলেন। কুসুম ধারাবাহিকতা লিখল। সুধীর উপস্থিত মানুষের নাম ও মতামত নথিবদ্ধ করল।

প্রথমে ১৩০৪ বঙ্গাব্দের বন্যার বিবরণ পড়া হলো। পাঁচ পাড়ার বহু ঘর ভেসে গিয়েছিল। জমিদার পরিবারের এক শাখা জলপথের জমি বিক্রি করতে রাজি হয়, কিন্তু দাম দিতে হয় গ্রামের মানুষকে। কেউ কড়ি, কেউ ধান, কেউ শ্রম, কেউ গয়না দেয়। শৈলবালা পাল বিধবা হয়েও নারীদের সংগঠিত করেন। তাঁর কাঁকন বিক্রির টাকায় দক্ষিণের জলমুখের অংশ কেনা হয়।

জহুরা বললেন, “আমাদের ঘরে শেফালি নামে গল্প ছিল।”

নন্দলাল উত্তর দিলেন, “নাম মুখে বদলেছে। কিন্তু কাজের স্মৃতি টিকে গেছে।”

দ্বিতীয় নথিতে সাধারণ সম্পত্তির শর্ত। কোনো মোড়ল, জমিদার বা উত্তরাধিকারী একক মালিক নয়। খাল ও বটতলা পাঁচ পাড়ার ব্যবহার্য। তৃতীয় নথিতে ১৯৬৭ সালের নথি পরিবর্তন। চন্দ্রেশ সামন্ত আপত্তি করেন। পরে তাঁর নামে আপত্তি প্রত্যাহারের নোট, কিন্তু স্বাক্ষর নেই। এই অংশ আইনগত তদন্তে যাবে।

হরিহর উঠে বললেন, “আমার বাবা কীভাবে নোট করিয়েছিলেন, আমি নিশ্চিত নই। তবে জমি আমাদের নামে ছিল জেনে আমি সুবিধা নিয়েছি। মহিমের ইজারা হলে ঋণ শোধের টাকা পেতাম। গ্রামের স্বার্থের কথা বলেছি, নিজের স্বার্থও ছিল।”

মোড়লপাড়ার কয়েকজন অস্বস্তিতে মাথা নামাল। কেউ হরিহরকে রক্ষা করতে চাইল। তিনি থামালেন। “আমার হয়ে কথা বলবেন না। যা করেছি, তা আমি বলছি।”

ফুলমতি সামনে এলেন। তিনি নৃপেন দের সংরক্ষিত পৃষ্ঠা তুলে ধরলেন। “এই কাগজ আমার বাবার কাছে ছিল। তিনি চন্দ্রেশ সামন্তের কাছ থেকে নকল নেন। আমাদের পরিবার পঞ্চগ্রাম ছেড়ে গেলেও কাগজ ফেলে যায়নি। আজ থেকে মূল আমার কাছে থাকবে, নকল গ্রামের। উৎসে বাবার নাম থাকবে।”

তারপর শৈলবালার ছবিটি দেখানো হলো। পাঁচ নারী কোদাল হাতে। তাদের মধ্যে তিনজনের সম্ভাব্য পরিচয় পাওয়া গেছে। বাকিদের নাম অজানা। কুসুম বলল, “নাম না পাওয়া মানে কাজ হয়নি নয়। নথিতে আমরা লিখব, অজ্ঞাত দুই নারী। ভবিষ্যতে তথ্য পেলে যোগ হবে।”

ভোলা দা বললেন, “আমি একজনের নাম শুনেছি, বসন্তী।”

সুধীর জিজ্ঞেস করল, “কার কাছে?”

ভোলা দা থামলেন। “মনে করতে সময় লাগবে।”

কুসুম বলল, “সম্ভাব্য সূত্র হিসেবে লিখব। নিশ্চিত নাম হিসেবে নয়।”

ভোলা দা একটু হতাশ, আবার গর্বিত। তাঁর কথাও নথিতে জায়গা পেল, তবে সঠিক ঘরে।

পাঠের পরে প্রশ্নের সময়। একজন জিজ্ঞেস করল, নথি কি আদালতে টিকবে। নন্দলাল বললেন, মূল, কপি, জরিপ, সাক্ষ্য ও প্রশাসনিক নথি মিলিয়ে আইনগত প্রক্রিয়া লাগবে। কেউ এখনই মালিকানা ঘোষণা করতে পারে না। আরেকজন জানতে চাইল,

শৈলবালার উত্তরাধিকারী জমি পাবেন কি না। নন্দলাল বললেন, নথি ব্যক্তিগত ভাগ নয়, সাধারণ ব্যবহারের শর্ত দেয়।

এক বৃদ্ধ বললেন, “তাহলে এত ঝামেলায় কার লাভ?”

জহুরা উত্তর দিলেন, “আমাদের ঘরে জল কম ঢুকেছে। লাভ গুনতে আর কী চাই?”

হাটতলায় হালকা হাসি উঠল।

জগন্নাথ স্কুলে “পঞ্চগ্রাম নথিকক্ষ” করার প্রস্তাব দিলেন। নথির কপি, মৌখিক ইতিহাস, পুরনো ছবি, জমির মানচিত্র, বন্যার নথি, স্বাস্থ্য তথ্য, সব রাখা হবে। কুসুমকে প্রশিক্ষণ নিয়ে দায়িত্ব নিতে বলা হলো। সে বলল, “আমি কলেজে ভর্তি হলে সপ্তাহে কয়েকদিন বাইরে থাকব।”

হরিহর বললেন, “তা হলে পালা করে অন্যরা থাকবে। দায়িত্ব মানে কারও জীবন আটকে দেওয়া নয়।”

চন্দনা দূর থেকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন।

ফুলমতির ব্যক্তিগত স্বীকৃতির কাগজ জনসমক্ষে পড়া হলো না। শুধু হরিহর ঘোষণা করলেন, তিনি ফুলমতির সঙ্গে তাঁর অতীত সম্পর্ক অস্বীকার করবেন না এবং সামাজিক অপবাদ সংশোধন করবেন। কেউ বিবাহের নাটকীয় প্রশ্ন তুলতে চাইলে ফুলমতি বললেন, “আমার জীবনের পরের অধ্যায় আপনাদের সভায় লেখা হবে না।”

এই বাক্যের পরে আর কেউ সাহস করল না।

পঞ্চানন শেষে পাঁচ কড়ি একে একে শিশুদের দেখালেন। বললেন, “এগুলো তাবিজ নয়। মানুষের অংশ।” জগন্নাথ যোগ করলেন, “আর নথি শুধু পুরনো নয়। বর্তমান সিদ্ধান্তের প্রমাণ।”

মাখন আসেনি। মহিমও নয়। তাদের বিরুদ্ধে প্রক্রিয়া চলছিল। কিন্তু হরিহর বললেন, তাদের পরিবারকে হাটে অপমান করা যাবে না। কাজের দায় ব্যক্তি ও আইনের, রক্তের নয়।

সূর্য নামার সময় পাঁচ কড়ি কাচের বাক্সে রাখা হলো। কাচের নিচে লেখা: “পাঁচ পাড়ার যৌথ অবদান, আনুমানিক ১৩০৪ বঙ্গাব্দ।” পাশে আরেক লাইন: “যে তথ্য নিশ্চিত নয়, তা প্রশ্ন হিসেবে সংরক্ষিত।”

কুসুম চাবি ঘুরিয়ে আলমারি বন্ধ করল। আলমারিতে দুইটি তালা। একটি চাবি কুসুমের কাছে, অন্যটি পাঁচ পাড়ার পালাক্রমিক প্রতিনিধির কাছে, প্রথম মাসে সুধীর। কোনো এক ব্যক্তি একা খুলতে পারবে না।

নথিকক্ষের দরজা বন্ধ হওয়ার পরে গোলাপী এসে সিঁড়িতে বসে পড়ল। তার পায়ে নীল ফিতা আর নেই। পূর্ণিমার রাতে জলে খুলে গেছে। হরিহর নতুন ফিতা বাঁধতে গেলে কুসুম বলল, “এইবার একটু ঢিলা।”

হরিহর সাবধানে গিঁট দিলেন। ক্ষমতা ভাগ করার পাঠ কখনো কখনো হাঁসের পায়ে শুরু হয়।

* * *

কারও গ্রামছাড়া হলো না। কাউকে বিনা বেতনে কাজের শাস্তি দেওয়া হলো না। পঞ্চগ্রাম প্রথমবার বুঝল, রায় মানে শুধু দোষীর শাস্তি নয়, ভবিষ্যতের নিয়মও।

পাঁচ পাড়ার সাধারণ সম্পদ রক্ষা কমিটি গঠিত হলো। প্রতিটি পাড়া থেকে একজন নারী, একজন পুরুষ, সঙ্গে স্কুলের একজন প্রতিনিধি এবং হাটের একজন। সভাপতির চেয়ার স্থায়ী নয়, তিন মাস অন্তর বদলাবে। হরিহর প্রথম সভায় সাধারণ সদস্য হিসেবে বসে অস্বস্তি বোধ করলেন। অন্য কেউ কথা কেটে দিলে তাঁর গোঁফ কেঁপে উঠত, কিন্তু তিনি নিজেকে থামালেন।

প্রথম সিদ্ধান্ত, খাল বছরে দুইবার পরিষ্কার হবে এবং কাজের হিসাব হাটতলায় টাঙানো হবে। দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত, কোনো ব্যক্তি বা ব্যবসা সাধারণ পথ, পুকুর বা জলমুখে কাজ শুরু করার আগে লিখিত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবে। তৃতীয় সিদ্ধান্ত, বন্যা ও জরুরি স্বাস্থ্য তালিকা প্রতি বর্ষার আগে নবায়ন হবে। চতুর্থ সিদ্ধান্ত, নথিকক্ষে মৌখিক ইতিহাস রেকর্ড হবে, কিন্তু প্রতিটি স্মৃতির সঙ্গে বক্তার নাম, তারিখ ও “যাচাই করা হয়নি” চিহ্ন থাকবে।

ভোলা দা আপত্তি করলেন, “আমার গল্পে এত সতর্কীকরণ দিলে মজা কমবে।”

কুসুম বলল, “গল্পে নয়। ইতিহাসের কপিতে।”

“তা হলে গল্প আলাদা ঘরে?”

“হ্যাঁ। আপনার নামে।”

ভোলা দা সন্তুষ্ট। তাঁর গপ্পবাজি প্রথমবার আনুষ্ঠানিক জায়গা পেল, তবে সত্যের ছদ্মবেশে নয়।

শিবুর দোকানের নতুন বোর্ড স্থায়ী হলো। মাসে একদিন স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কর্মী আসেন। প্রথম শিবিরে রক্তচাপ মাপার লাইনে হরিহর, পঞ্চানন, ভোলা দা সবাই। শিবু

নাম লেখে, ওষুধ দেয় না। কেউ তাকে ডাক্তার বললে সে সংশোধন করে, “শিবু পাল। প্রাথমিক সাহায্য করি।” একসময় মানুষ হাসত, পরে অভ্যাস হয়ে গেল।

মাখনকে আদালতের নির্দেশে অর্থ ফেরতের প্রক্রিয়া শুরু করতে হলো। সব টাকা একসঙ্গে নেই। সে কিস্তিতে দেবে। সুধীর হিসাব রাখে। মাখন মাঝে মাঝে বলে, “মানুষ নিজে থেকে দিয়েছিল।” সুধীর উত্তর দেয়, “ভয় দেখিয়ে নেওয়া সম্মতি পূর্ণ নয়।” পঞ্চানন তার সঙ্গে ব্যক্তিগত বিদ্বেষে জড়ালেন না। শুধু প্রকাশ্যে বললেন, বিশ্বাস ব্যক্তিগত, প্রতারণার হিসাব সামাজিক।

মহিমের গুদাম প্রকল্প বাতিল হয়নি, স্থগিত। প্রশাসন বিকল্প উঁচু জমি দেখার কথা বলেছে। মহিম কিছুদিন হাটে আসেনি। পরে ধান কেনার সময়ে এল। মানুষ তার সঙ্গে ব্যবসা করল, কিন্তু খালের জমি নিয়ে প্রশ্ন থামাল না। সামাজিক শাস্তি তাকে একঘরে করা নয়, নজরের মধ্যে রাখা।

রামলোচনের তিন মাসের পরীক্ষাকাল পূর্ণ হলো অগ্রহায়ণের শেষে। তিনি ডাল, ভাত, ডিমের ঝোল এবং মোটামুটি চা করতে শিখেছেন। চন্দনা বললেন, “এখনও লবণ নিয়ে কাজ বাকি।” তবু দুজন ছোট করে রেজিস্ট্রি বিয়ে করলেন। হাটতলায় কোনো নাটকীয় বরযাত্রা নয়। দুই পরিবার, কয়েকজন বন্ধু, কুসুম ও ফুলমতি সাক্ষী।

ভোলা দা জানতে চাইলেন, হাঁসের মাংস হবে কি না। চন্দনা বললেন, “গোলাপী উপস্থিত থাকবে। প্রশ্নটি তার সামনে করুন।”

ভোলা দা আর করেননি।

ফুলমতি শহরে ফিরে গেলেন। যাওয়ার আগে হরিহরের সঙ্গে বটতলার পাশে কিছুক্ষণ কথা বললেন। কেউ শোনেনি। বিদায়ের সময় হরিহর তাঁকে মোড়লবাড়িতে থাকার অনুরোধ করলেন না। শুধু বললেন, “চিঠি লিখব।”

ফুলমতি বললেন, “লিখে পাঠাবে। অপেক্ষা করতে বলবে না।”

হরিহর মাথা নেড়েছেন। পরে সুধীরের খাতায় হরিহরের নামে একটি খাম ও ডাকটিকিটের হিসাব দেখা গেছে। চিঠির ভিতর কী ছিল, সেটি আর গ্রামের নথি নয়।

কুসুম কলেজে পুনরায় ভর্তি হলো। সপ্তাহে তিন দিন বাসে যায়। প্রথম মাসে লোকেরা বলল, নথির কাজ থেমে যাবে। থামেনি। হরেন আলমারির ছবি তুলে সূচি বানাল। জগন্নাথ ছাত্রদের দিয়ে পুরনো শব্দের তালিকা করলেন। জহুরা ও চন্দনা নারীদের স্মৃতি রেকর্ড করলেন। কুসুম ফিরে এসে যাচাই করল। দায়িত্ব ভাগ হলে কাজ মানুষের অনুপস্থিতিতেও বাঁচে।

হরেন বাজারপাড়ায় ছোট মোবাইল মেরামতের টেবিল বসাল। নাম দিল “পাঁচপথ মোবাইল সারাই।” সাইনবোর্ডে বানান ভুল ছিল। কুসুম দেখে বলল, “সারাইয়ের ই কার ঠিক করো।”

হরেন বলল, “গ্রাহক আসুক আগে।”

“ভুল বানান দেখে গ্রাহক ফিরলে?”

পরদিন বানান ঠিক হলো।

বিনাপিসি প্রথম চিঠির জন্য প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইলেন। তিনি বললেন, ভয় দেখিয়ে ভালো কাজ আদায় করাও ঠিক নয়। তবে হরিহরও বললেন, তাঁর নীরবতা না থাকলে চিঠি লাগত না। দুই দায় পাশাপাশি লেখা হলো। গ্রামে প্রথমবার কোনো প্রবীণের ভুলকে হাসির বিষয় না বানিয়ে নথি করা হলো।

বটতলার গর্তের পাশে ফলক বসানো হলো। তাতে বাংলা অক্ষরে লেখা:

“এই স্থানে পঞ্চগ্রামের সাধারণ জলপথের নথি পাওয়া যায়। ২০১২। জল ও স্মৃতি উভয়ের পথ খোলা রাখুন।”

ফলক উন্মোচনের দিন গোলাপী তার গায়ে কাদা ছিটিয়ে দিল। হরিহর রাগলেন না। বললেন, “এটাই গ্রামের সিল।”

হাটতলার শেষ রায় কোনো মানুষের বিরুদ্ধে নয়। রায় ছিল, প্রশ্ন লেখা থাকবে, হিসাব খোলা থাকবে, এবং যে কণ্ঠ আগে শোনা হয়নি তার জন্য টেবিলে জায়গা থাকবে। নিয়মটি নিখুঁত নয়। প্রথম সভাতেই সময় নিয়ে ঝগড়া, দ্বিতীয় সভায় চায়ের বিল, তৃতীয় সভায় ভোলা দার গল্পের দৈর্ঘ্য। তবু পাঁচ পাড়া প্রথমবার বুঝল, প্যাঁচালও কাজ হতে পারে, যদি শেষে কেউ তারিখ, সিদ্ধান্ত ও দায়িত্ব লিখে রাখে।

* * *

জল তার পুরনো পথ চাইবে
● ● ● ● ●

২৮• নতুন চিঠি

ফাল্গুনের সকালে পঞ্চগ্রাম অন্য রকম দেখায়। ধানের খড় শুকনো, শিমুলে লাল ফুল, পুকুরের জল পরিষ্কার, কুয়াশা পাতলা। পুরনো খাল এখন সরু হলেও চলমান। দুই পাশে ঘাস। জলদ্বারের কাছে নতুন লোহার হাতল, ওপরের ফলকে খোলার নিয়ম। প্রতি মাসে পরীক্ষা হয়।

হাটতলায় সেদিন নথিকক্ষের ছয় মাস পূর্তি। কুসুম শহর থেকে ফিরেছে। ব্যাগে কলেজের বই, নোট এবং একটি নতুন কলম। জগন্নাথ স্কুলের শিশুদের নিয়ে পুরনো মানচিত্র দেখাবেন। ভোলা দা নিজের মৌখিক ইতিহাস রেকর্ড করার জন্য গলা পরিষ্কার করছেন। সুধীর ঘোষণা করেছে, রেকর্ডের সময় চা কাপের শব্দ কম রাখতে হবে।

হরিহর সাধারণ বেঞ্চে বসে। সভাপতির মোড়া আজ জহুরার। প্রথমদিকে এই দৃশ্য দেখে মোড়লপাড়ার কিছু মানুষ অস্বস্তি পেত। এখন তারা অভ্যস্ত। হরিহরও মাঝে মাঝে ভুলে নির্দেশ দিতে শুরু করেন, তারপর বলেন, "প্রস্তাব রাখছি।" ভাষা বদল ছোট, কিন্তু তা ক্ষমতার ভঙ্গি বদলায়।

গোলাপী হাটতলার মাঝখানে হাঁটছিল। নতুন নীল ফিতা আবার ঢিলা হয়ে গেছে। হরেন তাকে ধরতে গেলে সে সুধীরের দোকানের পেছনে ঢুকল। কিছুক্ষণ পরে ঠোঁটে ভেজা একটি খাম নিয়ে বেরোল।

খামে লেখা, "পঞ্চগ্রামের নথিকক্ষের জন্য।" কোনো ডাকটিকিট নেই। ভোরে কে রেখেছে, সুধীর দেখেনি। দোকান খোলার আগে পেছনের দরজা বন্ধ ছিল না।

সবাই একসঙ্গে কথা শুরু করল।

ভোলা দা বললেন, "আমি অনুমান করছি, এটি নতুন রহস্য।"

পঞ্চানন বললেন, "ফাল্গুনের চিঠি সাধারণত শুভ।"

শিবু বললেন, "ভেজা কাগজে ছত্রাক হতে পারে, সাবধানে ধরো।"

জগন্নাথ বললেন, “প্রথমে বাইরের অবস্থা নথি করো।”

হরেন ফোন বের করল। “ছবি নিচ্ছি।”

হরিহর বললেন, “এইবার দরজায় নয়, সরাসরি নথিকক্ষে এসেছে।”

জহুরা টেবিলে হাত ঠুকে বললেন, “একজন করে কথা বলুন। কমিটি আছে।”

কুসুম খামটি শুকনো কাপড়ের ওপর রাখল। হাতের লেখা কোনো পরিচিত মানুষের সঙ্গে মেলে না। কাগজ নতুন। ভেতরে একটি মাত্র পাতা। সে খুলে পড়ল।

“যে কথা লিখে রাখোনি, সে আবার হারাবে। হাটতলার উত্তরে পুরনো কুয়োর পাশে তিনটি নাম খুঁজো।”

নিচে কোনো পাঁচ বিন্দু নেই। আছে একটি ছোট আঁকা হাঁস।

সবাই গোলাপীর দিকে তাকাল। গোলাপী তখন সুধীরের বিস্কুটের কৌটো নিয়ে ব্যস্ত।

হরেন বলল, “ভোলা দা?”

ভোলা দা আহত গলায় বললেন, “আমার হাঁস আঁকার মান আরও ভালো।”

পঞ্চানন বললেন, “পুরনো কুয়ো বলতে কোনটা?”

সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ পাড়া পাঁচটি কুয়োর নাম বলল। মোড়লপাড়া বলল রায়বাড়ির উত্তর কুয়ো। কলাবাগান বলল বাঁশঝাড়ের শুকনো কুয়ো। পটলপাড়া বলল মাঠের ধারে পাথরঘেরা কুয়ো। মোল্লাপাড়া বলল পুরনো সাঁকোর কাছে। বাজারপাড়া দাবি করল, তাদের বাসস্ট্যান্ডের নিচে কুয়ো চাপা আছে।

জগন্নাথ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। “প্রথমে মানচিত্র।”

নন্দলাল সেই সময় পঞ্চগ্রামে ছিলেন না। তাঁকে চিঠির ছবি পাঠানোর ব্যবস্থা হলো। হরেন বলল, মোবাইল বার্তায় ছবি যাবে, তবে সংযোগ পেতে বটগাছের নিচে দাঁড়াতে হবে।

কুসুম চিঠিটি আবার পড়ল। তার মুখে হাসি এল।

হরিহর জিজ্ঞেস করলেন, "কী বুঝলে?"

"এখনও কিছু না।"

"তা হলে হাসছ কেন?"

"এইবার কেউ বলছে না, মেয়েদের কথা পরে শুনব।"

জহুরা বললেন, "কারণ চাবি তোমার কাছে।"

কুসুম মাথা নেড়ে বলল, "চাবি দুইজনের কাছে।"

সুধীর দ্বিতীয় তালার চাবি তুলে দেখাল। "আর খাতাও আছে।"

চিঠিটি নথিকক্ষে রাখা হলো। তারিখ, সময়, যে হাঁসটি খাম এনেছে তার বিবরণ পর্যন্ত লেখা হলো। ভোলা দা আপত্তি করলেন, গোলাপীর সাক্ষর নেওয়া হয়নি। গোপাল বলল, কাদা দিয়ে ছাপ নিলে চলবে। হরিহর এইবার নিজেই হাসলেন।

তারপর মানুষ পুরনো কুয়োর আলোচনা শুরু করল। কেউ চা খেল, কেউ মানচিত্র আনতে গেল, কেউ দাবি করল তিনটি নাম তার জানা। পঞ্চগ্রামের সকাল ধীরে ধীরে দুপুরের দিকে এগোল। পাঁচ রাস্তা হাটতলায় এসে মিলল, আর কথাগুলো আবার পাঁচ দিকে ছড়িয়ে পড়ল।

* * *

লেখক পরিচিতি

অনাবিল সেনগুপ্ত

অনাবিল সেনগুপ্ত পেশায় সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। দীর্ঘদিন ধরে গ্রামীণ অবকাঠামো, শিক্ষা এবং সরকারি প্রকল্পের মাঠপর্যায়ের কাজে যুক্ত থাকার অভিজ্ঞতা তাঁর লেখায় সমাজ ও মানুষের দৈনন্দিন বাস্তবতাকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখার সুযোগ দিয়েছে। তিনি বাংলা ভাষায় গল্প, প্রবন্ধ, গান এবং সমাজমনস্ক লেখা রচনা করেন।

বিজ্ঞানমনস্কতা, যুক্তিবাদ, কুসংস্কারবিরোধিতা, মানবিক সম্পর্ক, পরিবেশ, সাম্প্রদায়িকতা ও সামাজিক অসঙ্গতি তাঁর আগ্রহের প্রধান ক্ষেত্র। লেখালেখির পাশাপাশি তিনি বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী আন্দোলন, মানবতাবাদী উদ্যোগ এবং সাময়িকপত্র সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন।

তাঁর রচনায় সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা, সামাজিক ভণ্ডামি, ক্ষমতার ভাষা এবং হাসির ভিতরে লুকিয়ে থাকা বেদনা বারবার ফিরে আসে।

আধিকারিক ওয়েবসাইট
https://anabilsengupta.com/